ত্রয়োদশ বর্ষের সূচীপত্র সমাপ্ত।

আলোচনা

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

ত্রয়োদশ বর্ষ। | হাওড়া, বৈশাখ, সন ১৩১৬ সাল। | প্রথম সংখ্যা।

নববর্ষ।

(১)

নবীন হরষে, নূতন বরষ,
আসিছে হের অবনীপরে।
ভাগ্য-চক্র কার, কি ভাবে ফিরিবে
কে তাহা এখন বলিতে পারে॥
কার ভাগ্যে সুখ, দুঃখ কার ভালে,
ধাতার নিয়ম নহিবে আন্।
আমিত্ব ত্যজিয়া, সে পদ রাজীবে,
সঁপহ আনন্দে এ দেহ প্রাণ॥
উঠিলে প্রভাতে, স্মরি দুর্গা নাম,
যেমতি আনন্দে কাটে সে দিন।
বরষ প্রভাতে, ভক্তি রসে রসি,
হরষে মাতাও এ দেহ ক্ষীণ॥
অতীতের শত, তীব্র কষাঘাত,
ভুলহ চিত্তের অগণ্য জ্বালা।
গতস্য শোচনা, নিস্ফল আজিকে,
বিসর্জ্জন দাও বিষাদ মালা॥
দূরে ফেল টেনে, সব পুরাতন,
দূর কর সব পুরান গান।
নবীন বরষে, আলিঙ্গি হরষে,
লভহে সকলে নবীন প্রাণ॥

(২)

স'রে যা স'রে যা স'রে যা তুহারা
কে আছ নীরবে দাঁড়ায়ে পথে।
আনন্দ সঙ্গীতে, মুখরি প্রকৃতি,
নববর্ষ আসে কনক রথে॥

রথচক্র ধ্বনি, ওই যায় শুনা,
দেখা যায় ওই স্যন্দন ধ্বজ।
বিশ্ব বিমোহন, দিব্য জ্যোতিঃ তার,
চৌদিক ভাতিছে নেহার আজ॥
আর কেন তবে, নিরাশার কথা,
বিষাদে মলিন ফুল্ল--বয়ান।
নবীন বরষে, আলিঙ্গি হরষে,
নববল লভি হও আগুয়ান॥
নূতন বরষ, হেরি সমাগত,
সবাই উঠেছে আহ্লাদে মাতি।
দিকে দিকে আজ, কনক দীপিকা,
বিতরে হরষে অমল ভাতি॥

হেন শুভ দিনে, মোরাই কি শুধু
পুরাতন লয়ে রহিব পড়ি?
এই অভিশপ্ত, দাসত্ব কালিমা,
অটল রহিবে ললাটে ধরি?
এস এস ভাই, পবিত্র অন্তরে,
"জয় জগদীশ" গাহিয়া সুখে।
নূতন করিয়া, সাধনার গেহ,
রচিব হরষে ভারতবুকে।
চেতন-সঙ্গীত, "বন্দে মাতরম"
হইবে মোদের খেলার সাথী।
দেশহিত ব্রতে, প্রাণপণ করি,
পবিত্র করমে রহিব মাতি॥

শ্রীভূপতিচরণ চক্রবর্ত্তী।

রাজসূয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাজসূয় অতীব দুঃসাধ্য মহদীয় যজ্ঞ। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিলে কেহই প্রাচীন কালে রাজচক্রবর্ত্তী হইতে পারিতেন না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই যজ্ঞের সমগ্র অনুষ্ঠান সম্যকরূপে বর্ণিত আছে। অতি প্রাচীনকালে কোন্ কোন্ ক্ষত্রিয় নরপতি এই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন গ্রন্থে তাহার একটী তালিকাও প্রকটিত হইয়াছে। একমাত্র ক্ষত্রিয় রাজাই এই যজ্ঞ করিতে পারিতেন; এই যজ্ঞের সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অতি সামান্য সাদৃশ্য আছে; রাজচক্রবর্ত্তীর অপ্রতিদ্বন্দ্বিক প্রভুত্ব স্থাপন করাই উভয়ের উদ্দেশ্য হইলেও কোন কোন বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়।

রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিপুল ব্যয় ও কঠোর আয়াস সাপেক্ষ। সম্বৎসর ধরিয়া বিবিধ প্রক্রিয়ানুসারে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে থাকে। ইহাতে বিস্তর হোতা, বিপুল হবি ও যজ্ঞীয় পশু এবং রাশি রাশি

সোমরস আবশ্যক। সচরাচর ইহা ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী বা পূর্ণিমা তিথিতে আরব্ধ হইত। এই মহদীয় যজ্ঞ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় রাজন্যগণের সম্যক পরাজয় একান্ত আবশ্যক। যে রাজসূয়ে ভারতীয় রাজগণ পরাজয় স্বীকার করিয়া পূজোপচার প্রদান না করিতেন, তাহা সম্পন্ন হইত না। একজন মাত্র বিদ্রোহী বা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা থাকিলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত; এইজন্য অগ্রে সমগ্র রাজকুলের পূজা গ্রহণ করাই প্রথম কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে সেই প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। তাঁহার বীর্য্যবান্ ভ্রাতৃচতুষ্টয় ভারতের চারিটী অংশ জয় করিতে বহির্গত হইলেন। ভীম পূর্ব্ব দিক, অর্জ্জুন উত্তর দিক, নকুল পশ্চিম দিক এবং সহদেব দক্ষিণ দিক জয় করিতে গেলেন। ইঁহাদের এই ভয়াবহ অভিযানে বিস্তর ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। উত্তরে উত্তর-কুরু, পশ্চিমে বাহ্লিক ও কাম্বোজ দক্ষিণে সিংহল এবং পূর্ব্বে বঙ্গের পূর্ব্ব সীমান্ত—এই সুবিশাল সীমার অন্তর্গত বিস্তৃত ভূভাগের মধ্যে যত রাজা ছিল, সকলেই যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া পূজোপচারের নিদর্শন স্বরূপ রাশি রাশি ধন রত্ন লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইল। মহাভারতে এই সমস্ত ক্ষত্রিয় ও যবন রাজার নাম সম্বলিত একখানি বিস্তৃত তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই তালিকার অন্যান্য নৃপতিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরম শত্রু, শিশুপাল পৌণ্ড্রক বাসুদেব ও শাম্বের নামোল্লেখ আছে। ইহারা পাণ্ডবের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল বটে কিন্তু যজ্ঞস্থলে একটা বিষম গোলযোগ বাধাইবার ষড়যন্ত্র করিয়া আসিয়াছিল। যে কোন প্রকারেই হউক শ্রীকৃষ্ণকে অবমানিত করাই ইহাদের গূঢ় আন্তরিক অভিসন্ধি। জরাসন্ধ পরলোকগত হওয়াতে ইহাদের বল অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বটে, তথাপি ইহাদের তেজ ও গর্ব্ব কিছুমাত্র দমিত হয় নাই।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার পুত্র ও বন্ধুগণ যুধিষ্ঠিরের আকস্মিক অভ্যুদয়ে অভিতপ্ত হইলেও মুখে কিছুই প্রকাশ করিলেন না। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে পরম যত্নসহকারে আহ্বান করিবার নিমিত্ত প্রিয়দর্শন নকুলকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীম, বিদুর দুর্য্যোধন ও ভ্রাতৃগণ দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য ও কর্ণ প্রভৃতি সকলেই বিস্তর উপায়ন লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে এক একটী গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। 'কৃষ্ণ সর্ব্বলোকের বর্ত্তনাধার হইয়াও উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্তির কামনায় ব্রাহ্মণগণের পদ-প্রক্ষালনে স্বয়ং নিযুক্ত রহিলেন।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কর্ত্তব্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য; কিন্তু এই পর্ব্বাধ্যায়ের অন্য স্থানে আছে যে, "মহাবাহু ভগবান জনার্দ্দন শৌরি শার্ঙ্গচক্র-গদাধারী [illegible] সমাপ্তি পর্য্যন্ত সেই যজ্ঞ রক্ষা ক[illegible]" এই দুইটী মত পরস্পরের বি[illegible] গণের পদ-প্রক্ষালনে যে [illegible] নম্রতা সহিষ্ণুতা ও [illegible]

অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক যজ্ঞ-রক্ষণে তাহা অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বিতা ও বীরত্বের প্রযোজন। দুইটী কার্য্য ঠিক এক সময়ে এক সঙ্গে সম্পাদন করিতে না হইলেও এক ব্যক্তির দ্বারা উভয় কার্য্য সম্পাদিত হওযা অসম্ভব ;— অসম্ভব মানুষী বুদ্ধি ও শক্তির পক্ষে। যদি বলা যায় শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বরিক শক্তি প্রকাশ করিযা উক্ত দ্বিবিধ কার্য্যই যুগপৎ সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা হইলে সকল গোল-যোগেই অপনীত হয ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, তিনি মানুষীয় নাম স্বীকার করিয়া মানুষের সাধ্যাযত্ত উপায দ্বারা সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নতুবা তাঁহার অবতার স্বীকারের স্বার্থকতা উপলব্ধ হয় না। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে রাজসূয যজ্ঞের সময যুধিষ্ঠির নিযম করিযাছিলেন যে, ভোজন-প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণগণের একলক্ষ সংখ্যা পূর্ণ হইলেই নিয়ত এক একবার শঙ্খধ্বনি হইবে, তদনুসারে বারম্বার নিনাদকারী সেই শঙ্খের শব্দ নিরন্তর শ্রুত হইযাছিল। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সেই মহদীয় যজ্ঞে নিশ্চয়ই অসংখ্য ব্রাহ্মণের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ একাকী যে সেই কোটি কোটি ব্রাহ্মণের চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর বলিযা বোধ হয় ? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অপর কর্ত্তব্যটী সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সমগ্র রাজচক্রের উ[illegible]ধিপত্য স্থাপন করাই রাজসূয [illegible]প্রধানতম উদ্দেশ্য ; সুতরাং [illegible]বিপু[illegible]ও সেনাবল আবশ্যক।

যুধিষ্ঠিরের তদ্বিষে কোন অভাবই ছিল না ; কিন্তু একটী বিষয়ে তাঁহার অভাব ছিল ; তিনি সকলের আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলেও সকল শত্রু নাশ করিতে পারেন নাই। তাহা আবার যে সে শত্রু নহে,— শিশুপাল, পৌণ্ড্রক বাসুদেব; শাল্ব প্রভৃতি বীরগণ। ইহারা নানাবিধ উপাযন লইয়া যজ্ঞে উপস্থিত হইলেও মনে মনে যুধিষ্ঠিরের অনিষ্ট কামনা করিয়াছিল এবং কামনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম আদর্শ নীতি-বিদ হইয়াও যে, এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারেন নাই, একথা কিছু-তেই স্বীকৃত হইতে পারেনা, সুতরাং কৃষ্ণ যে, অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিযা সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত যজ্ঞ রক্ষা করিযাছিলেন, তাহাই উপযুক্ত ও সম্ভবপর বলিযা গ্রহণ করিতে পারা যায।

অর্ঘ্যাভিহরণ রাজসূয যজ্ঞের একটী প্রধান অঙ্গ। ইহা অভিষেচনীয় নামক সোমযাগের অব্যবহিত পূর্ব্বেই সম্পাদন করিতে হয়। তদনুসারে সৎকারভাজন মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ ভূপালবর্গের সহিত অন্তর্বেদিতে প্রবিষ্ট হইলেন। সকলে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যথাযোগ্য ব্যক্তিকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে বলিলেন। আচার্য্য, ঋত্বিক, স্নাতক, মিত্র ও নৃপতি এই ছয ব্যক্তি অর্ঘ্যপ্রদানের যোগ্য পাত্র। পণ্ডিতেরা বলেন অভ্যাগত হইযা সম্বৎসর সহবাস করিলেই সকল উপযুক্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কেই অর্ঘ্য দেওয়া যাইতে পারে। সভায় সকল ব্যক্তিই যুধিষ্ঠিরের নিকট সম্বৎ

সর কাল বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের জন্য এক একটী অর্ঘ্য কল্পিত হইল। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকে সর্ব্ব প্রথম অর্ঘ্য দেওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে আন্দোলন হইতে লাগিল। যে সভাস্থলে পরম প্রাজ্ঞ মহাত্মা কৃষ্ণ, দ্বৈপায়ন দ্রোণ ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, দ্রুপদ, স্বয়ং বসুদেব, দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহামনা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ আসীন রহিয়াছেন, তথায় কাহাকে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য, ইহা অতীব দুরূহ সমস্যা। অন্য কেহই এই সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিলেন না, এক মাত্র ভীষ্ম কৃষ্ণকে ভূমণ্ডল মধ্যে প্রধান অর্চ্চনীয় মনে করিয়া তাঁহাকেই অগ্রে অর্ঘ্য প্রদান করিতে বলিলেন। তদনুসারে সহদেব কৃষ্ণকে প্রধান অর্ঘ্য প্রদান করিলেন, কৃষ্ণও শাস্ত্রদৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন। তখনই সভামধ্যে মহা গণ্ডগোলের আবির্ভাব হইল। বাসুদেবকে প্রধান অর্ঘ্য দেওয়া হইল, শিশুপাল তাহা সহ্য করিতে পারিল না। সে পূর্ব্ব হইতেই ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, এক্ষণে অবসর পাইয়া তারস্বরে ইহার কঠোর প্রতিবাদ করিল। এই প্রতিবাদ এবং প্রতিবাদের প্রতিবাদ অতীব প্রীতি ও শিক্ষাপ্রদ; কেননা, ইহা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতার প্রধান মাণ-দণ্ড। ভারতের তদানীন্তন প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে প্রধান অর্ঘ্য দেওয়া হইলে তাঁহারা তাহাতে অনুমোদন করিলেন কি না, সেই ব্যাপার লইয়া কিরূপ বাদানুবাদ হইল এবং কিরূপেই বা তাহার মীমাংসা হইল, জানা আবশ্যক। এই জন্য এই ঘটনা আদ্যোপান্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

শিশুপাল যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিয়া কহিল "তুমি যে ইচ্ছাক্রমে কৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিলে এরূপ আচরণ মহাত্মা পাণ্ডবগণের উপযুক্ত হইল না। পাণ্ডবগণ! তোমরা বালক, কিছুই জান না। দেখ ধর্ম্ম অতি সুক্ষ্ম পদার্থ; এই অল্পদর্শী ভীষ্মেরও স্মৃতি শক্তি লোপ পাইয়াছে। কৃষ্ণকে স্থবির মনে করিয়া যদি পূজা করিয়া থাক, তবে বসুদেব বিদ্যমান থাকিতে তাহার পুত্র কিরূপে পূজাযোগ্য হইল? যদি প্রিয়ার্থী ও আত্মীয় বলিয়া পূজা করিয়া থাক, তাহা হইলে দ্রুপদ উপস্থিত থাকিতে মাধব কি প্রকারে পূজার্হ হইল? যদি আচার্য্য মনে করিয়া পূজা করিয়া থাক, তবে দ্রোণ বিদ্যমান থাকিতে কৃষ্ণকে কি নিমিত্ত পূজা করিলে। যদি ঋত্বিক মনে করিয়া পূজা করিয়া থাক, তবে ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণের পূজা কেন? যদি রাজা বলিয়া করিয়া থাক, তবে স্বয়ং দুর্য্যোধন যখন বিদ্যমান রহিয়াছেন, তখন রাজানামের অনধিকারী কৃষ্ণের পূজা কেন? এইরূপ বিবিধ বিদ্বেষগর্ভ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া যুধিষ্ঠিরের কার্য্যের প্রতিবাদ এবং কৃষ্ণের অবমাননা করিতে লাগিল। শেষে কৃষ্ণের উপর নানাবিধ কঠোর ও অশ্রোতোচিত কটুক্তি প্রয়োগ করিয়া কহিল—"ওহে কৃষ্ণ! ভীরুস্বভাব কুন্তী-তনয়গণ তোমার প্রীতিকামনায় যদিও তোমাকে অর্ঘ্যপ্রদান

করিল' তথাপি তুমি সেই সম্মানের উপযুক্ত পাত্র কি না, পূজা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তোমার তাহা বিবেচনা করা উচিত ছিল। অথবা কুক্কুর "যেমন নির্জ্জনে ঘৃত ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করে তদ্রূপ তুমি আপনার অযোগ্য অর্চ্চনা বহুজ্ঞান করিতেছ। পাণ্ডবেরা তোমাকে পূজা করিযাছে বলিযা গর্ব্বিত হইও না কারণ এতদ্দ্বারা তোমাকে নিশ্চযই উপহাস করা হইযাছে। ক্লীবের পক্ষে দ্বার পরিগ্রহ এবং অন্ধের পক্ষে রূপ দর্শন যেমন অসঙ্গত, রাজা না হইয়া তোমার রাজার ন্যায অর্চ্চনাও তোমার সেইরূপ উপহাসের বিষয।" এই কথা বলিয়া শিশুপাল পরমাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাজগণ সমভিব্যাহারে সভা হইতে বহির্গত হইল। এই খানেই বিপ্লবের সূচনা।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির শিশুপাল সমীপে সত্বর ধাবিত হইযা তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিলেন, 'মহীপাল, আপনি যেরূপ কথা বলিলেন, তাহা আপনার উপযুক্ত নহে; ইহাতে পরম অধর্ম্ম ও নিরর্থক কঠোরতা প্রকাশ পাইতেছে। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পরম ধর্ম্ম বোধগম্য করিতে পারেন না. ইহা কখনই সম্ভবে না; অতএব অন্যথা জ্ঞানে ইহাকে অবজ্ঞা করিবেন না। দেখুন, আপনার অপেক্ষা বৃদ্ধতম এই সকল ভূপালগণ কৃষ্ণের অর্চ্চনায কোন কথাই বলিতেছেন না। সেইরূপ আপনিও ইহা সহ্য করুন। কুরুনন্দন ভীষ্ম কৃষ্ণের স্বরূপ যথার্থ অবগত আছেন: ইনি কৃষ্ণকে যেরূপ জানেন আপনি উহাঁকে সেরূপ জানেন না।"

শিশুপালের প্রতি যুধিষ্ঠিরের এইরূপ. বিনীত বাক্য ভীষ্ম কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠিরকে মৃদু তীব্র ভাবে বলিলেন, "সকল লোকের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের অর্চ্চনা যাহার অভিমত না হয়, এতাদৃশ ব্যক্তিকে অনুনয় বিনয বা সান্ত্বনা করা উচিত নহে। এই মহাবাহু অচ্যুত কেবল আমাদিগেরই অর্চ্চনীয নহেন, ইনি ত্রৈলোক্যেরও প্রধান অর্চ্চনীয়, কারণ, অনেকানেক ক্ষত্রিযশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সমরে পরাস্ত হইযাছেন, অধিক কি সমগ্র বিশ্বই ইঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিযাছে, এই জন্যই বৃদ্ধবৃন্দ উপস্থিত থাকিতেও আমি কৃষ্ণকেই পূজা করিলাম, অপর কাহাকে নহে।"

অনন্তর তিনি শিশুপালকে সম্বোধন করিযা বলিলেন, "ওহে চেদিরাজ! সকল ভূমণ্ডলে সাধুগণ সমর্চ্চিত সর্ব্বভূতের সুখাবহ জনার্দ্দনকে আমরা কেবল ইচ্ছানুসারে, অথবা সম্বন্ধ, কিম্বা উপকারের অনুরোধে অর্চ্চনা করি, এরূপ কদাচ মনে করিও না। ইঁহার যশ, শৌর্য্য ও জযবৃত্তান্ত বিশেষরূপে জানিযাই আমরা ইঁহাকে পূজা করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সমধিক বলশালী, বৈশ্যদিগের মধ্যে প্রচুর ধনধান্য সম্পন্ন এবং শূদ্রদিগের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিই পূজনীয়, গোবিন্দের পূজ্যতা বিষয়ে বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞান ও অধিক বল, এই দুইটী হেতুই সমবেত রহিয়াছে।" বলিতে বলিতে কুরুবৃদ্ধ মহাত্মা ভীষ্মের তেজ ও গাম্ভীর্য্য যেন

শত গুণে বর্দ্ধিত হইল; তিনি সমবেত ক্ষত্রিয় মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভূপালগণ! দান, দাক্ষিণ্য, শাস্ত্রজ্ঞান, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি, উত্তমা বুদ্ধি, বিনতি, শ্রী, ধৃতি, তুষ্টি ও পুষ্টি—এই সমস্ত গুণই শ্রীকৃষ্ণে নিয়ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইনিই আচার্য্য, পিতা ও গুরু; অতএব অর্ঘ্য-ভাজন, এই জন্য আমরা ইঁহার পূজা করিয়াছি। আপনারা সকলে ইহার অনুমোদন করুন। হৃষীকেশ ঋত্বিক্, কন্যাদানের উপযুক্ত, স্নাতক, নৃপতি ও প্রিয়, এই জন্য আমরা ইঁহার অর্চ্চনা করিলাম। কৃষ্ণই সর্ব্বলোকের উৎপত্তি ও বিলয়ের কারণ, কৃষ্ণের নিমিত্তই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। ইনিই অব্যক্তা প্রকৃতি, কর্ত্তা, সনাতন এবং সর্ব্বভূতের অতীত; এই জন্যই অচ্যুত পূজ্যতম। বুদ্ধি, মন, মহত্তত্ব বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী ও জরায়ুজাদি ভূতচতুষ্টয় সকলই কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রপুঞ্জ গ্রহ সমুদায়, দিঙ্মণ্ডল, বিদিক্ সমস্ত, সকলই কৃষ্ণে বিরাজ করিতেছে। যেমন বেদচতুষ্টয়ের অগ্নিহোত্র, ছন্দ-সকলের গায়ত্রী, মনুষ্যদিগের রাজা, নদী সমুদায়ের সাগর, নক্ষত্র নিচয়ের চন্দ্র, জ্যোতিঃপুঞ্জের আদিত্য, পর্ব্বত-নিবহের সুমেরু এবং বিহঙ্গগণের গরুড় মুখ-স্বরূপ; তদ্রূপ কি উচ্চ, কি অধঃ, কি তির্য্যক প্রভৃতি যে সকল গতি নিরূপিত আছে, ভগবান কেশবই তৎসমুদায়ের মুখ-স্বরূপ। মূর্খ শিশুপাল বালকতা প্রযুক্ত কৃষ্ণকে বুঝিতে পারে না; এই জন্য সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা এই প্রকার সম্ভাষণ করিয়া থাকে।"

মহামতি ভীষ্মের কথাবসানে সহদেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ভূপালগণ অপরিমেয় পরাক্রমসম্পন্ন কেশিনাশন কেশবকে আমি যে পূজা করিলাম, তোমাদিগের মধ্যে যে কোন নরপতি ইহা সহ্য করিতে না পারেন, আমি তাদৃশ সমুদয় বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মস্তকে এই পদনিক্ষেপ করিলাম।" সহদেবের এই গর্ব্বোক্তির কেহই প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না,—অথবা ইচ্ছা করিয়া করিলেন না; শিশুপাল ক্রোধরক্তনয়নে গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং নরপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া বিকট স্বরে কহিল—"সেনানায়ক আমি যখন বিদ্যমান রহিয়াছি, তখন তোমরা আর কি ভাবিতেছ? আইস, সকলে সুসজ্জিত হইয়া সমবেত যাদব ও পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রামে অবস্থান করি। সমুদয় রাজগণকে এইরূপে সম্যক্ উৎসাহিত করিয়া শিশুপাল পরিশেষে যজ্ঞবিঘাতের নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। দারুণ ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহারা সকলেই কহিতে লাগিলেন, "যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের অর্চ্চনা না হয়, আমরা তাহাই করিব।"

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ।

অপ্রশংসিত ঐতিহাসিক কাহিনী।

ভারতের ইতিবৃত্ত-তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের অনেকেই অজ্ঞতা ও একদেশ-দর্শিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের কথাই বা বলি কেন?—পাশ্চাত্য আদর্শ-অনুকরণকারী পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন এদেশীয় কোনও কোনও ঐতিহাসিকও, বিজাতীয়ের বিকৃত তুলিকায় বিকৃত চিত্রের যে বীভৎস পরিস্ফুটন অবলোকন করিযাছেন; মোহিনী কল্পনা-শক্তিপ্রভাবে সেই বিকৃত চিত্রের বীভৎস অতিরঞ্জিত চিত্র লোক-সমাজে প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অতি প্রাচীনকালের কথা দূরে থাকুক; আধুনিক ইতিবৃত্ত-তত্ত্ব আলোচনায়ও সে ভাবের প্রকৃত অভাব পরিলক্ষিত হয় না। তাই দেখিতে পাই,—নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, অত্যাচারী, হীনবুদ্ধি প্রাচ্য-নৃপতিগণ দারিদ্র্যক্লিষ্ট নিরন্ন প্রজার অস্থিমজ্জা শোষণ করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করিতেছেন; তাই দেখিতে পাই,—দাম্ভিক, দুরাচার, অন্তঃসারহীন,সদা-চাটুকার পরিবৃত প্রাচ্য নৃপতিগণ দরিদ্র অসহায় প্রজার শেষ-রক্তবিন্দু সেই সঞ্চিত অর্থরাশি অযথা বিলাস-সম্ভোগে অপব্যয় করিতেছেন; তাই দেখিতে পাই,—ইন্দ্রিয়সুখরত, আত্মাভিমানী, আত্ম-প্রশংসা-শ্রবণানুরাগী,বারাঙ্গনা-পরিবেষ্টিত অসভ্য বিলাসী প্রাচ্য-নৃপতিগণ পুরমহিলা সমভিব্যাহারে মদ্যপানে নৃত্যামোদে কালযাপন করিতেছেন; তাই দেখিতে পাই—মদোন্মত্ত, বারবিলাসী, বালজনোচিতক্রীড়নকপ্রিয়, পশুপ্রতিম প্রাচ্য নৃপতিগণের বিবেক-বুদ্ধির উন্মেষ হয় নাই; তাই দেখিতে পাই,—কুরুচিপ্রিয় প্রাচ্য-নৃপতিগণের পাপকলুষিত অসার অন্তঃকরণ ধর্ম্মপ্রভাবে তাদৃশ উন্নত হয় নাই; তাই দেখিতে পাই,—মণি-মরকত-খচিত-শিরস্ত্রাণ-পরিহিত, কুঞ্চিত-চিকুরদাম-পরিশোভিত খগরাজ-লাঞ্ছিত-অতুল নাসিকা-বিশিষ্ট,তাম্বুল-রাগরঞ্জিত-বিম্ব-বিনিন্দিত-ওষ্ঠাধর, রক্তোৎপললোচন প্রাচ্য-নৃপতিগণ সদা ভোগ-বিলাসে রত রহিয়াছেন।

মেকলের যাদুমন্ত্র বিমুগ্ধ কি বিদেশীয়, কি দেশীয়—ঐতিহাসিকমাত্রেই, ইতিহাসে ঔপন্যাসিক চরিত্র-চিত্রের অবতারণা করিতে গিয়া, সত্যের যেরূপ অযথা অপলাপ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই দুঃখাবহ। প্রতীচ্যের দাম্ভিকতার তুলনায় প্রাচ্যখণ্ড অসভ্যতা ও বর্ব্বরতার লীলাক্ষেত্র হইতে পারে—সংশয় নাই। কিন্তু কথঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, সহজেই বুঝিতে পারা যায়,—অনন্তকালব্যাপী পৃথিবী কখনও বিলাসিতায় বা উচ্ছৃঙ্খলতায় শাসিত বা পরিচালিত হয় নাই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর,—এমন কি কলির প্রারম্ভের পরিচয়, অতীতের অন্ধতম গর্ভে নিহত রহিলেও, আধুনিক গ্রীস, রোম বা মোগল-শাসনাধীন ভারতের পুরাতত্ত্ব আলোচনায়ও সেই তথ্যই প্রমাণিত হয়। ভারতেতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়,—আকবর হইতে ঔরঙ্গজেব পর্য্যন্ত অসীম শক্তি-

শালী সম্রাট চতুষ্টয় নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে প্রায় দেড় শতাব্দী কাল দিল্লীর সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। আকবর ব্যতীত অন্য কাহারও ধর্ম্ম-বিষয়ে সমতা (Religious Toleration) না থাকিলেও, তাঁহাদের সুশাসনে দেশে শান্তি ও বিদেশে যশোসম্মান-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহারা শাসন-বিভাগের যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাদের শাসনকালে শিল্প-সম্পদের যেরূপ উন্নতি বিহিত হইয়াছে,—আরক্তিমলোচন, কুঞ্চিত-শ্মশ্রু-গুম্ফ-পরিশোভিত-বিম্বাধর সম্পন্ন খগরাজ-লাঞ্ছিত-অতুল-নাসিকা বিশিষ্ট ভোগ-বিলাসীর পক্ষে রাজ্যের সেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে কি ?

যাহাই হউক, ঐতিহাসিক মেকলে এবং তাঁহার পদাঙ্ক-অনুসরণকারী প্রত্নতত্ত্ববিদ্-গণের মাধুর্য্যময়ী কল্পনা-বিকাশে প্রাচ্য নৃপতিগণ বিকৃত তুলিকায় বিচিত্রিত হইলেও পারস্য-দেশীও সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাৎকালিক নৃপতিবৃন্দের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়-মান হয়,—যাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জের দুঃখ-দারিদ্র্য মোচন হইতে পারিত, তদ্বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ চেষ্টান্বিত ছিলেন। তাঁহারা বুঝিতেন, প্রজার হিতার্থেই রাজা রাজস্ব গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সুশাসন-সুপালনে দুর্ভিক্ষে দেশব্যাপী হাহাকার উঠিত না; কিম্বা তৎকালে উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষের প্রবল পীড়নে দেশবাসী আপামর সাধারণ নিরন্তর প্রপীড়িত হইত না। কচিত কখনও কোন প্রদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইলেই প্রবাদীকৃত ভোগৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত-স্থানেই অবস্থান করিতেন।

দেখিতে পাওয়া যায়,—সম্রাট সাজাহান যখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন ১৬২৯—৩০ খৃষ্টাব্দে, বিন্ধ্যাদ্রি হইতে কুমা-রিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমগ্র দাক্ষিণাত্যে একবারমাত্র দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষ প্রশমনার্থে বাদসাহ সাজাহান যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। "মীরাটি আমেদী" গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়,—বাদসাহের আদেশে বুরহানপুর, সুরাট এবং আহম্মদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এই সময় অসংখ্য অনাথাশ্রম ও অন্নসত্রাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্ষুধার্ত্ত-দিগকে আহার্য্য-সামগ্রী এবং মুদ্রাবস্ত্রাদি, সম্রাট অকাতরে প্রদান করিয়াছিলেন। প্রজাবর্গ দুই বৎসর করপ্রদানে নিষ্কৃতি-লাভ করিয়াছিল। তখন দুর্ভিক্ষ-সময়ে, দুঃস্থ প্রজাবর্গকে প্রবিশ্রম করিয়া উদর-পূর্ত্তি করিতে হইত না; "টাকাভি" দান বা 'রিলিফ' কার্য্যের প্রথা প্রবর্ত্তনের বিষয় তখন কাহারও মনে কখনও উদিত হয় নাই। ইহা সম্রাটের অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। কারণ প্রজার দুঃখ নিবারণই তখন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; পারিশ্রমিক দানে দুর্ভিক্ষ-নিবারণের ব্যবস্থা ছিল না। সে হিসাবে, বাদসাহ সাজাহান, আধুনিক রাজ-পুরুষগণের নিকট রাজনীতি-জ্ঞানাভাব-প্রযুক্ত উপহাসাস্পদ

হইলেও, আর্য্য শূন্য স্থানে হস্তী পোষণের ন্যায় শ্বেতাঙ্গ-অনুমোদিত বৃথা-প্রশংসিত দুর্ভিক্ষ-বিভাগের ব্যবস্থা করেন নাই।

এইরূপে দেখা যায়,– মুসলমান রাজত্ব-কালে, শতবৎসরে, গড়ে পাঁচ-ছয়টী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেও, প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা তাদৃশ শোচনীয় হয় নাই। * কিন্তু এখন? বিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও সভ্যতার পরিচায়ক দুর্ভিক্ষ একদিনের জন্যও দেশ পরিত্যাগ করিল না? তাই বলিতেছিলাম,—পারস্য দেশীয় ঐতিহাসিকগণ সমসাময়িক মোগল বাদসাহগণের যে দিনলিপির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন —তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, —স্বার্থান্ধ আধুনিক ঐতিহাসিগণের ভারত-তত্ত্ব আলোচনা, তাঁহাদের দাম্ভিকতা ও বর্ব্বরতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক মাত্র। দিল্লিশ্বর সাজাহানের প্রজাবাৎসল্য প্রবাদ-মূলক মনে হইলেও, তাঁহার কার্য্য নৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য-পরম্পরা বিশ্লেষণে বুঝা যায়,—জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণে, তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রতিই তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। সুশাসন-সুপালনের সুশৃঙ্খলা বিধানে, স্বপ্রতিষ্ঠিত দিল্লী-নগরী পরিত্যাগ করিয়া, বাদসাহ সাজাহান আগরার রাজ-প্রসাদেই জীবনাতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে তাহারই দৈনন্দিন রাজকার্য্য-নির্ব্বাহ প্রণালীর কথঞ্চিৎ আভাষ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাদসাহ সাজাহানের নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি বিশ্লেষণে দেখিতে পাই,—প্রত্যুষে চারি ঘটিকার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া, প্রাহ্নিক উপাসনান্তে, সাজাহান বিদ্যাচর্চ্চায় পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিতেন। প্রায় তিন ঘণ্টা এতদুভয় কার্য্যে অতিবাহিত হইত। ৬-৪৫ টার সময় তিনি দর্শন গবাক্ষ— "ঝরোকা-ই-দর্শন"—উন্মুক্ত করিয়া দর্শনদানে রাজ-দর্শনে সমাগত প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিতেন। তৎকালে প্রত্যুষে রাজদর্শন পুণ্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। তাই, অনন্য-কর্ম্মা হইয়া প্রজাপুঞ্জ প্রত্যহ প্রত্যুষে রাজ-দর্শনে সমাগত হইত। কিন্তু সে কাল আর নাই। রাজদর্শনে অধুনা আর কাহারও তেমন আগ্রহ বা ঔৎসুক্য দেখিতে পাই না; রাজদর্শন লাভও আর আজ কাল তেমন সহজসাধ্য নহে। সপ্ত-সমুদ্রের পরপারে রাজা। দর্শনের আশা দুরাশা মাত্র। রাজ-প্রতিনিধি যিনি, তিনি সশস্ত্র প্রহরী-পরিবেষ্টিত। প্রহরীর নিষ্ঠুর পীড়নভয়ে প্রাসাদ অভিমুখে কেহ আর অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। দর্শনদানে প্রজার অভাব-অভিযোগ স্বকর্ণে শুনিতেও কেহ আর অভিলাষী নহেন। হায় সে কাল।

* ইংরেজাধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী দুঃভিক্ষগুলির মুখ্য কারণ বেল যুদ্ধ বিগ্রহ। পর্জ্জন্য দেবের কুটিল কটাক্ষ বড় কেহ মানিত না। এতৎসম্বন্ধে জনৈক প্রসিদ্ধ তত্ত্বানসন্ধিৎসু লিখিয়াছেন,—"Regarding the famines that occured before the British occupation of India, not enougo is known to enable us even to make but a correct list of the years or the causes of these visitation, Some of these which we find were due to war rather than the drought".

যাউক সে কথা। দর্শনদানে প্রজার মনোরঞ্জনই বাদসাহ সাজাহানের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল। আগরা দুর্গের পূর্ব্ব প্রান্তে অধুনা যে উচ্চ প্রাচীর, যমুনার বিশাল তটদেশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান, সেই প্রাচীর-গাত্রে তখন একটী সুপ্রশস্ত গবাক্ষ দৃষ্টিগোচর হইত। সে গবাক্ষের অস্তিত্ব আছে কিনা, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণেরই তাহা প্রমাণ্য। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে, সেই গবাক্ষ সম্মুখে, যমুনার সুবিশাল তটদেশ-সংলগ্ন সমতল ক্ষেত্রে, প্রত্যহ প্রত্যুষে অগণিত প্রজা, রাজা-দর্শনে সমবেত হইত। সূর্য্যোদয়ের পর, প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইলে, বাদসাহ সাজাহান সেই উন্মুক্ত বাতায়নে উপবিষ্ট হইয়া, সমবেত জনমণ্ডলীকে দর্শন দানে পরিতৃপ্ত করিতেন। ঈশ্বরপ্রতিম বাদসাহকে দেখিবামাত্র উৎকণ্ঠিত জনসঙ্ঘ যথারীতি তাঁহাকে অভিবাদন-অভিভাষণ করিত। সম্রাটও নিয়মানুক্রমে প্রকৃতিপুঞ্জের অভিবাদন গ্রহণ করিতেন।

এইরূপে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বা তদূর্দ্ধ পরিমিত সময় অতিবাহিত হইত। কিন্তু এসময়েও সম্রাটের রাজকার্য্যে বিরতি ছিল না। দুর্গ-প্রাকারের বহির্ভাগে, এই বিশাল সমতল ক্ষেত্রে, সকলেই স্বাধীন-ভাবে গতিবিধি করিতে পারিত। সুতরাং উৎপীড়িত ব্যক্তিমাত্রেই স্বয়ং অবাধে সম্রাটের নিকট আপন আপন দুঃখ-কাহিনী প্রকাশ করিবার যথেষ্ট সুবিধা পাইত। সে সম্বন্ধে কাহারও সঙ্কোচ বোধ হইত না; দ্বারবানকে বা আরদালীকে পুরস্কৃত করিবার প্রথাও ছিল না; কর্ম্মচারিগণকে উৎকোচ প্রদান করিতেও হইত না; অথবা, বিচারালয়ের অত্যধিক ব্যয়-বাহুল্যও কেহ বহন করিত না। অথচ, প্রজাবর্গ অবাধে আপনাদের অভাব-অভিযোগের বিষয় স্বয়ং সম্রাটের নিকট জ্ঞাপন করিতে পারিত। এইরূপে রাজা-প্রজা পরস্পর পরস্পরের মনোভাব প্রত্যহ জানিতে পারিতেন। তখনও স্থানীয় কর্ম্মচারীর কথায় বিশ্বাস করিয়াই, বাদসাহ কোনও গুরুতর কার্য্য করিয়া বসিতেন না। তখনও 'ম্যান-অন দি স্পট' (Men on the spot) স্থানীয় কর্ম্মচারী ছিল বটে; কিন্তু বাদসাহ কখনই তাঁহার কথার দাস হইতে পারেন নাই। তাই দরিদ্র প্রজার অভাব-অভিযোগ দূরীকরণেও অধিক বিলম্ব ঘটিত না। অধুনা, প্রজার দুঃখ-কাহিনী, অভাব-অভিযোগের বিষয় যথাযথরূপে রাজার নিকট বিবৃত হয় কিনা—তদ্বিষয়েই নানা সন্দেহ জন্মে। কিন্তু তৎকালে বাদসাহ স্বয়ং সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। প্রতিনিধিগণের কার্য্য-পরম্পরা সর্ব্বথা অভ্রান্ত হইলেও, সম্রাট কখনই তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। প্রজার অভাব-অভিযোগের বিবরণও তাই বাদসাহের নিকট নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিতে পারিত। সে সুবিধার জন্য দর্শন-গবাক্ষে এক গাছি রজ্জু সংলগ্ন থাকিত; প্রজাগণ তাহাতে আপনাপন আবেদন বাঁধিয়া দিত; সম্রাটের পরিচারকবর্গ সেই রজ্জুবদ্ধ আবেদন তুলিয়া লইয়া সম্রাটের হস্তে প্রদান করিত। এ প্রথা—দিল্লীশ্বর আকবরই প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার বংশধরগণও যথানিয়মে সে

প্রথার অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই দর্শন-প্রসঙ্গে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক। বাদসাহগণের রাজত্বকালে, আগরা নগরীতে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। প্রত্যুষে রাজদর্শনই যেন তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম ও ধর্ম্ম-কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। যে দিন তাঁহাদের ভাগ্যে রাজদর্শন মিলিত না, সে দিন আর তাঁহারা অন্নজল গ্রহণ করিতেন না; সে দিন তাঁহাদের পক্ষে দুর্দ্দিন বলিয়া মনে হইত। ধার্ম্মিকের প্রাণের এ ভাব—স্বাভাবিকই বটে!

এইরূপে দর্শন-দান এবং অভাব-অভিযোগ-শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্য শেষ হইলে, সমাগত প্রকৃতিপুঞ্জ স্ব স্ব কার্য্যে যথাস্থানে গমনে আদিষ্ট হইত। তখন, প্রান্তর জনশূন্য হইলে, সম্রাট মত্ত-হস্তীর যুদ্ধ দর্শন করিতেন। স্বয়ং সম্রাট ব্যতীত সে আদেশ আর কাহারও দিবার অধিকার ছিল না। এমন কি, যুবরাজগণ বা রাজবংশোদ্ভব অপর কেহ, মত্ত-হস্তীর যুদ্ধারম্ভের আদেশ প্রদানে ক্ষমবান ছিলেন না। বাদসাহ সাজাহানই মত্ত-মাতঙ্গের যুদ্ধ দর্শনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার প্রীতি-বর্দ্ধনার্থ কখনও-কখনও বা দশ-বারটী মত্ত-মাতঙ্গকে একযোগে সেই বিশাল প্রান্তরে যুদ্ধে নিযুক্ত করা হইত। যুদ্ধ-দর্শন শেষ হইলে, মাতঙ্গ-চালকগণ নব-সংগৃহীত কুঞ্জরপুঞ্জ সম্রাটের সমক্ষে আনয়ন করিত। এই বিশাল প্রান্তরেই তাহাদের শিক্ষা প্রদান করা হইত, এবং এই স্থানেই সম্রাট সাজাহান প্রতিদিন আপন অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

অতঃপর, বেলা অনুমান চারি দণ্ডের সময় (৭-৪০ মিনিট) বাদসাহ সাজাহান "দেওয়ানী-আম" বা প্রকাশ্য রাজ-দরবারে মন্ত্রিগণের সহিত শাসন-পালন সংক্রান্ত কার্য্য-পরম্পরা সম্পাদনে মনোযোগী হইতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

কে সে?

১

কোমল কঠিন কভু কঠিন কোমল,
কুসুম সে অশনি—অশনি ফুল দল।
গরলে অমৃত বয়, সুধা হলাহল হয়,
সলিলে অনল জ্বলে—অনলে সলিল—
অনিলে তড়িৎ—দেখ তড়িতে অনিল।

২

ভূপের ভবন কভু পাতার কুটির;
দীনের আবাস শোভে যেন নৃপতির—
দাতা যে কৃপণ স্থির, কৃপণ সে দানবীর,
চিররোগী নীরোগ নীরোগ চিররোগী,
বিযোগী সংযোগী হয়—সংযোগী বিযোগী!

৩

শ্মশান উদ্যান—কার উদ্যান শ্মশান—
যোগী কভু গৃহী, গৃহী যোগী পুণ্যবান!
গোমূর্খে পণ্ডিত হয়,　পণ্ডিতেরে মূর্খ কয়,
বীরের বীরত্ব যায় কাহার প্রভায়?
দুর্ব্বল যে বলবান্ কাহার কৃপায়!

৪

মুমূর্ষু উঠিয়া বসে—বলী শয্যাশায়ী
বৈষ্ণব মাতাল—সুধা ছাড়ে মদ্যপায়ী।
সরল কুটিল হয়,　কুটিল করুণাময়,
শশাঙ্কে রবির আলো—সূর্য্যে সুধা ঝরে
কার বলে জ্ঞান সেই কিবা নাম ধরে?

৫

সুরূপ কুরূপ হয় কুরূপ সুন্দর,
দুর্ব্বলের কেবা বল—বলী-বল-হর।
কি সম্পদে প্রাণ যায়, কি বিপদে প্রাণ পায়,
সম্পদের উপহাস—বিপদে বিভব—
অসম্ভব সম্ভব—সম্ভব অসম্ভব!

৬ ,

তস্কর সাধুত্ব পায়—সাধু সে তস্কর
নরে সে নারীর ভাব—নারী হয় নর।
লোভীর সে লোভ চূর্ণ, নির্লোভীর লোভ পূর্ণ,
অন্ধে পায় আঁখি—আঁখি আছে যার যায়—
লোহা সোনা—সোনা লোহা কাহার দয়ায়?

৭

সিন্ধু শুষ্ক হয়—শুষ্কভূমি পূর্ণ জলে—
পাষাণ গলিয়ে যায় দগ্ধ তরু ফলে!
দেবকে দানব করে,　পিশাচ স্বভাব ধরে,
দানব দেবতা হয় মুখে কথা কয়—
কাহার প্রভাব বলে ঘটে সমুদয়

৮

কাহারে খুঁজিয়া ফিরে জীবকুল—
কার তরে প্রাণমন সদাই ব্যাকুল!
(বাক্যে নাহি বলা যায়) বিদ্যুৎগতিতে ধায়,
নিরাকারে সাকারের কর্ম্ম কিবা করে—
কর্ম্মফলে বাঁধে কেবা বিশ্ব চরাচরে!

৯

প্রবীণ সে যুবা হয় যুবা সে প্রবীণ,
দীন হয় ধনী—ধনী হয় দেখ দীন!
ভাবপূর্ণে কি অভাব,　অভাবের ঘরে ভাব,
পলকে হাসায় কেবা কাঁদাতে কে পারে,
কার তরে হাসিমুখে পড়ি গো পাথারে!

১০

শত দুঃখে পড়ি—বাঁচিবারে চায় প্রায়—
শত গঞ্জনায় নাহি ভাবি অপমান!
নীচ যেই হয় উচ্চ,　সুরপুরী ভাবে তুচ্ছ,
কার বলে কেবা সেই কোথা করে বাস?
কারে না পাইলে হয় জীবনে হতাশ।

১১

রত্নমালা কাচ—কাচ হয় রত্নহার!
আঁধারে রবির আলো স্বর্গ কারাগার—
কেবা করে নিমীলিত, কেবা করে বিকসিত,
হৃদি সরসীর মাঝে কমলের বন—
কে বীণা বাজায়—তার ছেঁড়ে কোন জন?

১২

কে বা বহুদূরে রাখে—কে আনে নিকটে,
লুকায়ে দেখায় ছবি মানসের পটে!
আত্মহারা আঁখিধারা,　বহে পাগলের পারা,
কেবা তারে করে পূত জাহ্নবীর নীর—
বিষধারে কেবা করে মাতৃস্তন্য ক্ষীর!

১৩

ঈর্ষানলে জ্বলে—হিংসা সুদূরে পালায়,
ফণী ফণা তুলে ভয়ে বিবরে লুকায়—
বেঁধে দেয় মোহপাশে, মায়া দূরে রেখে আসে
সাত্ত্বকে উন্মাদ করে বোষে ক'রে ক্ষয়,
কেশরী মৃগের সনে হেসে কথা কয়!

১৪

স্বার্থশূন্য—স্বার্থপূর্ণ কে করিতে পারে!
দর্পে নাহি চাহে—দর্প কিন্তু হায় হারে।
নিজ জনে পর করে, পরে ডেকে আনে ঘরে,
দেখ সেই মুগ্ধ মন—বিদ্ধি কাম-শরে
সেই সে কামের কাম—সাধে নাশ করে!

১৫

মরিতে বাসনা—পুন বাঁচিয়ে মরণ—
রাখে ধর্ম্ম—নাশে পুণ্য বিচিত্র ঘটন।
রাখি হৃদি সিংহাসনে, দেখি কারে সযতনে,
প্রাণ নিয়ে বিসর্জ্জিযে পূজা করি কার?
পূর্ণব্রহ্ম সেই প্রেম পূজ্য সবাকার!

শ্রীমতী দুর্গাবতী।

অভিন্ন।

তোমার আমার ভাই,
একি ভগবান,
একি বিধি দিয়াছেন
উভযেব প্রাণ;
লভেছি জনম দোঁহে
একই ধরায,
একি বায়ু দুজনের
জীবন জুড়ায;
একি রবি শশী তাবা
তোমাব আমার,
একি নদী নদ হ্রদে
সম অধিকার;
শিরো'পরে উভযেবি
একই আকাশ
ষড়ঋতু একি ভাবে
তোষে বারোমাস;
উভয়ের তরে পাখী
একি গান গাহে,
উভয়ের প্রতি প্রেম
একি চোখে চাহে;
একি ফুল দুজনের
চির মনোরম,
একি দিবা, একি রাতি
নাহি বেশী, কম;
সকলিত' এক ভাই
তোমার আমাব;
একি ধবা উভযের
প্রীতির আধার;
বিধাতার প্রেম-রাজ্যে
নাহি ভেদাভেদ,
মূঢ় যারা বোঝেনাক
মিছা করে খেদ;
পরম ধরম প্রেম,
সে ধরম সাধ
নাহি যার, শিরে তার
কর পদাঘাত।

শ্রীগিরিজাকুমার।

পরিচিত।

অন্ধের সম নয়ন মুদিয়া,—
যে'তে পারি সেই পথে,
মৃত্যুর পরে যেই পথ দিয়া,
যেতে হয় ধরা হ'তে।
সে যে ওগো! সোজা সে বাড়ীর পানে,
নিঃসঙ্গ একা সবে তাহা জানে,
নিজেরে নিজেই হেথা ভাই ছাড়ি'
ছুটেছি বহ্নি রথে ;
মৃত্যুর পর যেই পথ দিয়া,
যাইব বিশ্ব হ'তে।

পৃথিবীর পিতা সেথা বসে আছে
লইয়ে সুপ্ত দেহ,
স্বপন অন্তে ফিরে তারি মাঝে
কাঁপায়ে তুলিব গেহ।
নয়ন ক্লেদ মুছাইবে মোর,
শত চুম্বনে স্নেহ বিভোর,
পিতা, নেবে বুকে, মনে পড়িবে না,
ধরা আর কোন মতে ;
অন্ধের সম নয়ন মুদিয়া
যেতে পারি সেই পথে।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

দাসত্ব।

ধন্য রে দাসত্ব ধন্য তোর মায়া,
ধন্য তব শক্তি অসীম কায়া,
যাহারে লেগেছে তোমার হাওয়া,
বশীভুত তুমি করেছ তারে।
মনেতে আসিলে স্বাধীন ভাবনা,
তখনই তুমি দাও হে মন্ত্রণা,
ওরূপ করম করোনা করোনা,
কেনরে ডুবিবে দুঃখ সাগরে।

২

আমার মিলনে কি দুঃখ তোমার,
প্রতিপত্তি তব ভরিয়া সংসার,
কত শত জন তব উমেদার,
এত সুখ কেন ছাড়িবে হায়।
তব সম সুখী আছে কোন জন,
ভাবিয়া কি তুমি দেখনা কখন,
তোমার ইঙ্গিতে কত শত জন,
সাগর মাঝারে অনা'সে যায়।

৩

এত সুখ ছাড়ি কিসের কারণে,
ব্যবসা করিয়া ভ্রমিবে ভুবনে,
কত দুঃখ তায় ভাব কি স্বপনে,
ধনে প্রাণে কেন মজিতে যাও।
আমি যার বন্ধু কি ভয় তাহার,
স্বাধীনতা শুধু বিড়ম্বনা সার,
উহাতে উন্নতি হবে না তোমার,
ইচ্ছা করে কেন মরিতে চাও।

৪

ধন্য ধন্য ধন্য তব চতুরালী,
যাহাতে মোহিত যতেক বাঙ্গালী,
ধরিয়াছে শিরে কলঙ্কের ডালি,
সদা জুতা লাথি খাইতে চায়।
ধরি তব পায় ওহে মায়াময়,
ছাড় ছাড় শীঘ্র মোদের ভারত,
এই ভিক্ষা সবে মাগি তব পায়,
ত্যজহ মোদের হয়ে সদয়!

শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষ।

অকারণ।

ভাঙ্গিয়াছে সুখ-স্বপ্ন শৈশবের মধুময়,
উঠিয়াছে হাহাকার আলোড়িয়া স্তব্ধ-ভীতি,
দিগন্তের অন্ধকারে মিলিয়া বিচ্ছেদ ভয়,
বুক-ভরা আলোরাশি ছাপিয়া দিতেছে
নিতি।

নিভৃত-আড়াল হতে ক্ষণেকের চপলতা
যে রাগিণী তুলেছিল ভরাইয়া বিশ্ব-প্রাণ,
তাহার ঝঙ্কার, সখা,—প্রেমময়-পবিত্রতা
সঞ্জীবিত করেছিল এ হৃদয় মুহ্যমান।

সাধনার চিরদীপ্ত উজ্জ্বল-মধুর-স্মৃতি
মিলায়েছে ধীরে ধীরে বিরহের পদতলে,
অতীতের সুমধুর মিলন-পুলক-গীতি
বহিবেক পুণ্যময় অনাবিল-অশ্রুজলে।
বিষাদের ছায়ামাঝে আলোকের প্রতিদান
আকাঙ্ক্ষার প্রাণ নহে,—এই মোর
ধ্রুব-জ্ঞান।

শ্রীভুবন মোহন দত্ত।

কুমার ভীমসিংহ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ন্যায়ের জয় অবশ্যম্ভাবী। সত্যেতে বাধা দিতে গেলে তুমি স্রোতোমুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। রাণী অবজ্ঞা ভরে সুষ্পষ্ট ঘৃণার স্বরে এই কথাগুলি বলিয়া ধীরে ধীরে গর্ব্বিতা নারীর ন্যায় সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

(৩)

মহিষী চলিয়া গেলে, তাঁহার বজ্র-গম্ভীর তিরস্কার মহারাজের মস্তিষ্কের মধ্যে অবিশ্রান্ত ভাবে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। তিনি বার বার শুনিতে লাগিলেন, "যে সূর্য্যবংশে রাজা দশরথ সত্য পালনের জন্য প্রাণসম পুত্র রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়াছিলেন, সেই সূর্য্যবংশে না তোমার জন্ম ?" মহারাজের মাথা ঘুরিতে লাগিল, শত শক্তি-শেলবাণ এককালীন যেন তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিল, মহারাজাধিরাজ রাজসিংহ আজ ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় অধীর হইয়া বলিলেন, "ছি, ছি, পবিত্র সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করতঃ স্নেহের পদতলে ন্যায়কে বিসর্জ্জন দিয়া অন্যায়কে আশ্রয় করিয়াছি। ভগবান। নিষ্কলঙ্ক সূর্য্যবংশে কালিমা প্রদানের জন্যই কি এই কুলাঙ্গারকে এই অকলঙ্ক সূর্য্যবংশে প্রেরণ করিয়াছিলে ?

মহারাজের ভ্রমান্ধ-নয়ন আজ হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল। এতদিন তিনি যে অন্যায়কে হৃদয়ে পোষণ করিয়া ন্যায়কে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, আজ তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, স্নেহের অনুরোধে ভীমসিংহের প্রতি কি অন্যায়ই না করিয়াছেন। তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার মানস করিয়াছেন। কিন্তু যে এক মুহূর্ত্তেরও বড় হইবে সেই রাজ্য পাইবে।" এতদিন স্নেহে অন্ধ হইয়া তাহা

তিনি দেখিতে পান নাই, তাই তিনি ভাবিতেন যে, ভীমসিংহও জয়সিংহ অতি অল্পক্ষণেরই ছোট বড়, সেজন্য কাহারো রাজ্যে কোন অধিকার জন্মে নাই, আমার রাজ্য আমি যাহাকে ইচ্ছা দান করিব। স্নেহে অন্ধ হইয়া তিনি যে ভীমসিংহের প্রতি একেবারেই দেখিতেছেন না, তাহা একদিনও তাঁহার মনে আসে নাই, আজ হঠাৎ তাঁহার সে ভ্রম সে মোহ কাটিয়া গেল। চিন্তাতে সমস্ত রাত্রি রাজসিংহের নিদ্রা আসিল না, সুকোমল শয্যা কণ্টকময় বোধ হইতে লাগিল, তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন, শত বৃশ্চিক তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। এই প্রকার ভীষণ কষ্টে সমস্ত রজনী কাটিয়া গেল। প্রভাত হইল, অমনি রাজসিংহ ভৃত্যের প্রতি আদেশ করিলেন :—"যুবরাজ ভীমসিংহকে আমার কাছে লইয়া আইস" ভীমসিংহ কিরূপে "যুবরাজ হইলেন!" তাহারা জয়সিংহকেই যুবরাজ বলিয়া জানে, সেজন্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল, সহসা এ কথা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাহাদের বোধ হইল মহারাজ ভুলক্রমে জয়সিংহের স্থানে ভীমসিংহের নাম করিয়াছেন সেজন্য সে ভীমসিংহকে ডাকিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল তাহা দেখিয়া মহারাজ বলিলেন—"অত ভাবছ কি? যুবরাজ ভীমসিংহকে এ স্থানে আসিতে বল!" ভৃত্য যো হুকুম মহারাজ বলিয়া বাহিরে আসিয়া আশ্চর্য্য ব্যঞ্জক "হুম" শব্দ করিয়া ভাবনার বোঝা কমাইল, তারপর ভীমসিংহের নিকট আগমন করিয়া মহারাজের হুকুম জানাইল। পিতা ডাকিতেছেন শুনিয়া ভীমসিংহ অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন একসঙ্গে শত বজ্রপাত হইতে দেখিলেও তিনি তত আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন কিনা সন্দেহ; তাঁহার কাছে ইহা অতীব নূতন। ইতিপূর্ব্বে পিতা কখন তাঁহাকে ডাকাইয়াছেন বলিয়া ভীমসিংহের স্মরণ হইল না, তিনি ভাবিলেন, পিতা হঠাৎ ডাকিলেন কেন? জয়সিংহকে রাজা করিয়া আমাকে তাহার পদ সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্যই কি ডাকিয়াছেন? কিন্তু এ হস্ত যতদিন অসিধারণে সক্ষম থাকিবে ততদিন যে আর কাহারও সিংহাসনে বসিবার ক্ষমতা নাই, তাহা বুঝি তিনি জানেন না? পিতার পক্ষপাতিতা স্মরণ করিয়া ভীমসিংহ ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহার নয়নদ্বয় ক্রুদ্ধ শার্দ্দুলের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। বদনমণ্ডল ভীষণ আকৃতি ধারণ করিল, একবার ভাবিলেন, যাইব না, আবার ভাবিলেন, না পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আজ স্পষ্ট ভাষায় মনের কথা প্রকাশ করিব। ভীমসিংহ ক্রোধকে সহচর করিয়া পিতার নিকটে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু যখন রাণার মলিন মুখ-মণ্ডলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল বৃদ্ধ-মুখে নিদারুণ বিষাদের চিহ্ন যখন দেখিতে পাইলেন, যখন দেখিলেন—রাজার চিন্তাকুল নয়ন তাঁহার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টি করিতেছে, তখন ভীমসিংহ সে ক্রোধ সহচরকে কোথায় দূরীভূত করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। ক্রোধ ও প্রতিহিংসা তখন মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় চলিয়া গেল, সেই

স্থানে কেবল কষ্টের ভাব, দুঃখ কোমল প্রকৃতি আসন গ্রহণ করিল। ভীমসিংহের সেই নির্ম্মল প্রশান্ত, সৌম্যমূর্ত্তি ও সম্মানপূর্ণ ভাব দেখিয়া মহারাজ বিস্মিত হইলেন। তিনি এতক্ষণ ভীমসিংহের যে দম্ভপূর্ণ বদন, আরক্ত নয়ন, কুঞ্চিত ললাট, ক্রোধ-কম্পিত কলেবর ভীমমূর্ত্তি দেখিবেন ভাবিয়াছিলেন, ভীমসিংহকে সেই মূর্ত্তিতে না দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। পুত্রের সে সম্মান ভবে অভিবাদন করা ও সে প্রশান্ততা, তাহার সে ভক্তির ভাব রাণার হৃদয়ে যেরূপ অনুতাপানল জ্বালিয়া দিল—ভীমসিংহের সহস্র ভ্রুকুটি, সহস্র ক্রোধও তাহা পারিত না। লজ্জায় অনুতাপে রাজা ভীমসিংহের প্রতি আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না, অবনতমুখে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"বৎস ভীমসিংহ।" এই স্নেহপূর্ণ স্বর শুনিয়া ভীমসিংহ চমকিত হইলেন। মহারাজ ত কখনও এমন স্নেহপূর্ণ স্বরে আমায় আদর করিয়া ডাকেন নাই! পিতার কাছে চিরকালই তিনি অনাদর পাইয়া আসিতেছেন। তাঁহার মনে আছে, একদিন দুই ভাইয়ে ক্রীড়া করিতেছিলেন, রাণা সেই স্থান দিয়া যাইবার সময় জয়সিংহকে কত আদর করিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না, অভিমানী বালক সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আরাবলী-পর্ব্বতের নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কত না কাঁদিয়াছিল? তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতার পক্ষপাতিতা পদে পদে দেখিয়া আসিয়াছে, তারপর অবশিষ্ট যাহা ছিল, রাজা জয়সিংহকে সিংহাসন দিবেন বলিয়া তাহা হইতেও বঞ্চিত করিয়াছেন। তাহার পিতার হৃদয়ে যে একবিন্দুও স্নেহ তাঁহার জন্য আছে তাহা এতদিন তিনি মনে করিতে পারেন নাই। হঠাৎ এতদিন পরে রাণা আজ যখন স্নেহস্বরে ডাকিলেন—"বৎস ভীমসিংহ!" তখন তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, তিনি কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"পিতঃ!" এত দিন তিনি পিতাকে মহারাজ সম্বোধন করিয়া আসিয়াছেন। মহারাজ ভীমসিংহের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আমি ন্যায়কে পদতলে দলিত করিয়া তোমার প্রতি যারপর নাই অন্যায় আচরণ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর?" ভীমসিংহের বীরনেত্র দিয়া কয়েকটা অশ্রুবিন্দু বক্ষে পড়িল। পিতা যে তাঁহার অন্যায় এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন, এতদিনের পরে যে তিনি তাহাকে বাৎসল্যস্নেহে অভিষিক্ত করিলেন—সেই আনন্দে তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়া তাঁহার অভিমান কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। তিনি অন্তকার ন্যায় বিমলানন্দ জীবনে আর কখনও অনুভব করেন নাই। তিনি স্বর্গীয় ভাবে বিভোর হইয়া উদ্বেলিত-চিত্তে মনে মনে বলিলেন, "পিতঃ! তোমার স্নেহে সন্দেহ করিয়াছিলাম বলিয়াই আমি এতদিন তোমার স্নেহ বুঝিতে পারি নাই। সে দোষে আমি তোমার কাছে দোষী, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" ভীমসিংহকে নীরবে অবস্থান করিতে দেখিয়া রাজা বলিলেনঃ—বৎস, তুমি আমাকে ক্ষমা করিতে অসমর্থ হইলেও আমি আমার

অপরাধের প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকটে দোষমুক্ত হইব! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তোমার ন্যায্য অধিকার তোমাকেই প্রদান করিব, রাজমুকুট তোমারই মস্তকের শোভা বর্দ্ধন করিবে। আমি তোমাকে সিংহাসন দিলেও একটী বাধা আছে, যাহা জয়সিংহের প্রাপ্য না হইলেও আমার দোষে সে তাহা পাইবার আশা করিতেছে—এখন সে হঠাৎ সে আশা পরিত্যাগ করিবে না রাজ্যলোভে দেশকে অরাজকতায় পরিণত করিবে—চতুর্দ্দিকে সমরানল হইবে, দেশ হাহাকার ধ্বনিতে পূর্ণ হইবে--তাহাতে মিবার-রাজ্য উৎসন্ন যাইবে। এই সকল প্রতিকারের একটী মাত্র উপায় নাই।" এই বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে ঝনঝনা শব্দে অসি বাহির করিয়া উর্দ্ধে উত্তোলন ধরিলেন। প্রভাতকালীন নবসূর্য্যরশ্মিতে অসিখানি ঝকমক করিতে লাগিল, তিনি তাহা ভীমসিংকে দেখাইয়া বলিলেন, লহ বৎস, এই শাণিত অসি দ্বারা জয়সিংহের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া আইস। এক জনের জন্য শত শত নির্দ্দোষ প্রাণীর রক্তপাত হওয়া অপেক্ষা এক জনের রক্তে মেদিনী রঞ্জিত হওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়। বৎস ভয় পাইলে হইবে না, কর্ত্তব্যের নিকটে পিতামাতা, ভাই-ভগিনী, এমন কি প্রাণাধিক স্ত্রী-পুত্রগণের প্রতি স্নেহ-মমতা করিলে চলিবে না।" বলিতে বলিতে রাজসিংহের স্বর কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। ভীমসিংহ চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারাজের হৃদয়ের ভাব আজ আলেখ্যের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে প্রস্ফুটিত হইল, কর্ত্তব্যের অনুরোধে যে আজ আপনার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্র-রত্নকে বিসর্জ্জন দিতেছেন—তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। পিতার সে উদারতা, সে কর্ত্তব্য-পরায়ণতা সে মহত্ব পুত্রের হৃদয়ে আঘাত করিল—তাহার পিতার প্রতি ভক্তি সহস্রগুণে বাড়িয়া উঠিল। ভীমসিংহ বুঝিলেন, রাণা যে অসি জয়সিংহের বুকে বিদ্ধ করিতে দিতেছেন, প্রকারান্তরে তাহা নিজের হৃদয়েই বিদ্ধ করিতেছেন। ভীমসিংহের মুখে আর কোন কথা ফুটিল না, তিনি মনে মনে বলিলেন, "পিতঃ! তুমি মনুষ্য হইয়াও দেবতা।"

রাজসিংহ পুত্রকে নীরব দেখিয়া পুনরায় বলিলেন বৎস, এ কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। ন্যায়ের জন্য প্রজার মঙ্গলের জন্য, দেশের শান্তির জন্য এ হত্যায় কোন প্রকার পাপ স্পর্শিবে না, যদি স্পর্শে সে তোমায় নহে, আমায় স্পর্শিবে। আমার আদেশে তুমি কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পন্ন কর।" ভীমসিংহ কথা কহিলেন, পিতার হস্ত হইতে অসি গ্রহণ করিয়া তাহা পিতার পদতলে স্থাপন করিয়া বলিলেন, পিতঃ। আপনার অসি আপনি ফিরাইয়া লউন, আমার ইহাতে কোন আবশ্যক নাই। আপনি আমার প্রতি যে অবিচার করিয়াছিলেন, তাহার উচিতমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন আপনি আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, এখন আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করিব। আমার

দ্বারা যাহাতে রাজ্যে একবিন্দুও শোণিতপাত হইতে না পারে, যাহাতে কণামাত্র পাপ ও জয়সিংহকে স্পর্শ না করে, আমাকে তাহাই করিতে হইবে, ইহাই এখন আমার প্রধান কর্ত্তব্য। আপনি অদ্য আমাকে যে অধিকার দান করিলেন, অদ্য হইতে আমি তাহা জয়-সিংহকে প্রদান করিব, অদ্য হইতে এ রাজ্য তাহার হইল। এ স্থানে অবস্থান করিলে, যদি মোহ বশতঃ কখনও রাজ্যে লোভ জন্মে সেজন্য অদ্য হইতে আমি এ রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি। যদি ইহার অন্যথা করি, আমি আপনার সন্তান নহি।"

মহারাণা বাধা দিবার বা কথা কহিবার পূর্ব্বেই ভীমসিংহ ক্ষিপ্রহস্তে পিতৃ চরণ স্পর্শ করিয়া এই অঙ্গীকার করিলেন। মহারাজও স্তম্ভিত হইয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেইদিনই ভীমসিংহ স্বহস্তে জয়সিংহকে রাজমুকুট পরাইয়া দিয়া প্রিয় সৈন্যসামন্তগণকে লইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—আর কখনও দেশে ফিরি-লেন না। অনেক দিন পরে তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ লইয়া মিবারে ফিরিয়া আসিল।

শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চি।

কৃষিকর্ম্ম।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মনি,
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।"

যে ভারতে একদিন উপরি উদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা বাণিজ্য এবং কৃষি মহিমা বিঘোষিত হইয়াছিল, যে ভারতে মনু, বশিষ্ঠ,পরাশরাদি শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ উচ্চকণ্ঠে কৃষি বাণিজ্য সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, যে ভারতের আর্য্য-সন্তান শাস্ত্রবাক্য শিরো-ধার্য্য করিয়া দেশ বিদেশে আপনাদের শিল্প কৃষি জাত বস্তু-সম্ভার প্রেরণ করতঃ বাণিজ্য-কার্য্যে জগতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিয়া সুদূর মহাদেশ সমূহে আপনাদের কীর্ত্তি-পতাকা প্রোথীত করিয়াছিলেন, আজ সেই ভারত সন্তানকে বাণিজ্য ও কৃষি মহিমা বুঝাইবার জন্য সভা সমিতি স্থাপন এবং প্রবন্ধ রচনা করিতে হইতেছে! দৈবের এমনই চক্র! কালের এমনই কুটিল গতি!

সংস্কৃতজ্ঞ ঋষি কবিগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও বঙ্গের বাঙ্গালী কবিও বহুকাল হইল সে দৈববাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া গিয়াছেন,

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাস,
রাজ সেবা কত খচমচ।"

কিন্তু আমরা এতই অনার্য্য হইয়া পড়িয়াছি যে প্রকৃত সম্মানকে অসম্মান বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করতঃ আমরা অসম্মানকেই সম্মান বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি। এখন রাজসেবা অথবা ভিক্ষাই আমাদের

জীবনের একমাত্র সম্মানের লক্ষ্যস্থল বলিয়া আমরা স্থির করিয়াছি। আমরা যাহা কিছু শিক্ষালাভ করিতেছি তাহাও এই সেবা অথবা ভিক্ষাবৃত্তির জন্য। শিক্ষা লাভ করিয়া, বি-এ, এম-এ, পাশ করিয়া যদি কেহ বাণিজ্য কিম্বা কৃষিতে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করে, তবে আমরা প্রকৃতই তাহার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া মধ্যম নারায়ণ তৈল ব্যবহারের ব্যবস্থাই তাহার সম্বন্ধে প্রযোগ করিয়া থাকি, এরূপ ক্ষেত্রে যদি আমরা কৃষি বিষয়ক প্রস্তাবে আলোচনা'র কলেবর আচ্ছন্ন করি তাহা হইলে আমরা পাঠক সাধারণের ক্ষমার্হ হইব কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ।

তবে সুখের মধ্যে এই যে দেশের বাতাস যেন ফিরিতে আরম্ভ করিযাছে; ভগবানের কৃপাদৃষ্টিপাতে আমাদের মোহ নিদ্রা অপগত হইয়া প্রকৃত জ্ঞাননেত্রের উন্মিলন হইতে আরম্ভ করিযাছে! প্রকৃত সম্মানের পথের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে। এই সে দিন পাবনা সহরের সমুদয় গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণগণ কৃষির শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণচ্ছলে স্বহস্তে লাঙ্গল মুষ্টি ধারণ পূর্ব্বক হলকর্ষণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। সুতরাং এরূপ সময়ে কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ একেবারে ঘৃণিত বিবেচনায় উপেক্ষিত নাও হইতে পারে, এই বিবেচনায় সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

এ স্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে লেখক কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে বসিলেও নিজে কৃষক বৃত্তিধারী নহেন। সেবা বৃত্তিধারী; তবে অবশ্য তাঁহার কৃষি বিষয়ে একটা আগ্রহ থাকায় কৃষি সম্বন্ধে তাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে। তদবলম্বনে তথা এতদ্বিষয়ক পুস্তকাবলীর সাহায্যেই এ বিষয়ের বক্তব্য প্রকটিত করিতে যত্নপর হওয়া যাইবে।

কৃষি কার্য্য প্রকৃত পক্ষেই নিন্দনীয় কার্য্য নহে। কেন যে ইহা আমাদের সমাজে হেয় ও ঘৃণ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে তাহার কারণ নির্ণয় করা দুরুহ। কোন কোন সমাজে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চ বর্ণ যদি হলমুষ্টি ধারণ করিয়া ক্ষেত্রে হল চালনা করেন তবে তাঁহাদের সমাজচ্যুতির ব্যবস্থাও আছে শুনিতে পাওয়া যায কিন্তু আমাদের শাস্ত্র মধ্যে এরূপ দেখিতে পাই না। সাধারণতঃ অশিক্ষিত লোকে এই কার্য্যে ব্রতী থাকে বলিয়াই বোধ হয় কৃষি কার্য্য দ্বারা তাহাদের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইবার আশঙ্কাবশতঃ উচ্চ বর্ণ উহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তদনুসারে সামাজিক আচার তালিকা হইতে কৃষি বহির্গত হইয়া নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ে আবদ্ধ রহিয়াছে।

আরও একটী কারণ থাকা অসম্ভব মনে হয় না। পূর্ব্বে বৃত্তিরক্ষণটাও একটা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত ছিল।

যাহার যাহার সম্বন্ধে যে যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল সে সেই বৃত্তিই অবলম্বন করিয়া চলিত বৃত্তন্তর পরিগ্রহ দূষনীয বলিয়া বিবেচিত হইত এবং তজ্জন্য সামাজিক ও শাস্ত্রীয়

শাসনেরও ব্যবস্থা ছিল। তদনুসারে কর্ম্ম-কার, কুম্ভকার, মালাকার, তৈলিক, সূত্রধর ইত্যাদি ব্যবস্থানুগত জাতির সৃষ্টি হইয়াছে কর্ম্মকার কুম্ভকারের বৃত্তি গ্রহণ করিত না। সূত্রধর মালাকার হইতে পারিত না। এইরূপে শস্য উৎপাদনরূপ কার্য্য ও কৃষি-সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি ন্যস্ত ছিল, তাহারা ভিন্ন অন্যের তাহাতে অধিকার ছিল না। এক হিসাবে এই নিয়ম যে মন্দ তাহা বলা যায় না, বরং ইহাতে নানা সুফলই প্রসব হইয়া থাকে। এক এক জন এক এক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সেই সেই কার্য্যের ঔৎকর্ষ সাধনে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে পারে এবং তাহাতে সেই সেই কার্য্যের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যে সমুদয় দেশে জাতিভেদ প্রথা আমাদের দেশীয় ভাবে প্রচলিত নাই তথায় এক ভাবে এইরূপ কার্য্যগত জাতিভেদ বর্ত্তমান আছে এবং থাকিবে। তবে বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণও যখন মুচির ব্যবসা করিয়া পতিত হইতেছেন না তখন ব্রাহ্মণ কৃষি অবলম্বন করিলেই বা পতিত হইবেন কেন? আর সমাজই তাঁহাকে অপদস্থ করিবেন কেন?

পাবনার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে এই হলযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা বড় ভাল কাজ করিয়াছেন। হলচালনা করা সমাজ ও ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য ইহা আর সে অঞ্চলের কোন লোক প্রচার করিতে সাহসী হইবেন না এবং উচ্চবর্ণের কেহ উক্তরূপ কার্য্যে ব্রতী হইলে আর তাঁহার অপদস্থ হইবার আশঙ্কাও নাই।

দেশের অন্নরক্ষা একটি প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা ক্রমেই বেশী গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। দেশের ধান চাউলের মূল্য ক্রমেই এরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে যে সাধারণ লোকের পক্ষে দৈনিক দুইবার পেট ভরিয়া খাওয়াই একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। অতএব এরূপ ক্ষেত্রে যাহাতে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকিতে পারে, তাহার জন্য সকলেরই যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। এখন আর শুধু মুখের কথায় স্বদেশের হিতসাধন হইতে পারে না। কার্য্যের সময় উপস্থিত। বারান্তরে আমাদের দেশের কৃষক ও কৃষি প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী, বি,এ।

Prineid at Karmayoga Printing Workes 208-210
Khurut Road Howrah by Printer
H L. Dass.

নরসেবা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মচরিতের এক স্থানে লিখিয়াছেন :—

"আবার সেই ভাদ্র মাসের মেঘ বিদ্যুতের আড়ম্বর প্রাদুর্ভূত হইল এবং ঘন ঘন ধারা পর্ব্বতকে সমাকুল করিল। সেই অক্ষয় পুরুষেরই শাসনে পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার শাসনকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। এই সময়ে আমি কন্দরে কন্দরে নদী প্রস্রবণে নব নব বিচিত্র শোভা দেখিয়া বেড়াইতাম। এই বর্ষাকালে এখানকার নদীর বেগে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়; কেহই এ প্রমত্ত গতির বাধা দিতে পারে না। যে তাহাকে বাধা দিতে যায়, নদী তাহাকে বেগ-মুখে দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়। একদিন আশ্বিন মাসে খদে নামিয়া নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্ম্মল ও শুভ্র, ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল! এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে, ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জ্জনা ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে, তবে কেন এ সেই দিকেই প্রবলবেগে ছুটিতেছে? কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার কি ক্ষমতা? সেই সর্ব্ব নিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইয়াও ভূমি সকলকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামিনী হইতেই হইবে। এই প্রকার ভাবিতেছি, এই সময় হঠাৎ আমি আমার অন্তর্য্যামী পুরুষের আদেশ বাণী শুনিলাম—তুমি এ উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর। আমি চমকিয়া উঠিলাম; তবে কি আমাকে এই পুণ্যভূমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? আমার ত এ ভাবনা কখনই ছিল না। কত কঠোরতা স্বীকার করিয়া সংসার হইতে উপরত হইয়াছি, আবার সংসারে যাইয়া কি সংসারীদিগের সহিত মিশিতে হইবে? আমার মনের গতি নামিয়া পড়িল। সংসার মনে পড়িল, মনে হইল, আবার আমাকে

করিয়া বাড়ী যাইতে হইবে, সংসার কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইবে। এই ভাবনাতে আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, ম্লান ভাবে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রিতে আমার মুখে কোন গান নাই। ব্যাকুল হৃদয়ে শয়ন করিলাম, ভাল নিদ্রা হইল না। রাত্রি থাকিতে থাকিতে উঠিয়া পড়িলাম, দেখি যে, হৃদয় কাঁপিতেছে, বুক জোরে ধড় ফড় করিতেছে। আমার শরীরের এমন অবস্থা পূর্ব্বে কখনই ঘটে নাই। ভয় হইল, কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়াই বা আমার হইল। বেড়াইতে গেলে যদি ভাল হয়, এই মনে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেকটা পথ বেড়াইয়া সূর্য্য উদয় হইলে বাসাতে আসিলাম, তাহাতেও আমার বুকের ধড়্ফড়ানি গেল না। তখন কিশোরীকে ডাকিলাম এবং বলিলাম,—কিশোরি! আমার আর শিমলাতে থাকা হইবে না, ঝাঁপান ঠিক কর। এই কথা বলিতে বলিতে দেখি যে, আমার হৃৎকম্প কমিয়া যাইতেছে। তবে এই কি আমার ঔষধ হইল? আমি সেই সমস্ত দিনই বাড়ী যাইবার জন্য স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম--ইহাতেই আমি আরাম পাইলাম। দেখি যে, সে ধড়ফড়ানি আর নাই, সব ভাল হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের আদেশ বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া, সে আদেশের বিরুদ্ধে কি মানুষের ইচ্ছা টিকিতে পারে? সে আদেশের বাহিরে একটু ইচ্ছা করিতে গিয়া প্রকৃতি শুদ্ধ বিরুদ্ধে দাঁড়াইল, এম্নি তাঁহার হুকুম। 'হুকুম অন্দর সব কোই, বাহার হুকুম না কোই'। আর কি শিমলাতে থাকিতে পারি? প্রকৃতিরা তখন আমাকে বলিতেছে, এই দুই বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে কত কষ্ট দিলে, কত সাধ্য সাধনা করিলাম, আমাদের একটী নির্দ্দোষ প্রবৃত্তিকে পরিতোষ করিলেন না; এখন আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, আর তোমার শুশ্রূষা করিতে পারি না। প্রকৃতিরা দুর্ব্বল হউক আর সবলই হউক, আর কি শিমলাতে থাকিতে পারি?" তাঁহার ইচ্ছাতেই আমার কার্য্য। তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছা মিশাইয়া বাড়ী আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার মনে বল আসিল। এখনো পথে ভয় আছে, স্থানে স্থানে এখনো বিদ্রোহী দল রহিয়াছে, কিন্তু আমি আর সকল ভাবনাকে স্থান দিলাম না। নদী যেমন আপনার বেগমুখে প্রস্তরের বাধা মানে না, আমিও তেমনি আর কোন বাধা মানিলাম না।

মহর্ষি যে বলিয়া গিয়াছেন, "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব", এখানেই তাঁহার ভিত্তি দৃঢ় ভাবে সংস্থাপিত হইল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সময়েই যেমন এক দিকে এক নিরাকার পরব্রহ্মের প্রীতিযোগে উপাসনার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন, অপর দিকে তেম্নি আবার নানা প্রকারে মানবের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সেবা প্রথম অবধিই সত্যধর্ম্মের এক প্রধান সাধন। মহর্ষিও শিমলা শৈলে

সাধনার্থ যাইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে এবং অন্য প্রকারে অনেক জনহিত-কর কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু সংসারের উত্তপ্ত বায়ুতে তিনি অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না; সংসারের নানা প্রকার ঝঞ্ঝাবাতে তাঁহাকে সংসার বিরাগী করিয়া তুলিল; তিনি এই সকল ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের প্রবাহ হইতে দূরে থাকিয়া নির্জ্জন গিরিকন্দরে, প্রকৃতির বিচিত্রতার মধ্যে একাকী নিরলে সেই দেবাদিদেবের ধ্যানেই জীবন অতি-বাহিত করিবেন, এই বাসনা লইয়াই শিমলা শৈলে গমন করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এরূপ অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। কিন্তু মানুষের ইচ্ছার উপরে আর এক ইচ্ছা রহিয়াছে, ভগবান্ তাঁহার দ্বারা জগতের কার্য্য করাইয়া লইলেন। মানবের সেবা ধর্ম্মের অঙ্গ, ইহা এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজেও জ্ঞান গত-ভাবে নিবদ্ধ ছিল, মহর্ষির জীবনে তাহা ঈশ্বরের "হুকুমে" পরিণত হইল; প্রীতি যেমন ধর্ম্মের একান্ত আবশ্য-কীয় অঙ্গ, সেবাও সেইরূপ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হইল। মহর্ষি দেখিলেন, নদী সকল নিম্নে গমন করিয়া পৃথিবীর ক্লেদ ও ময়লাতে মলিন হয়; তবুও সে পৃথিবীকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য তাহাকে ধৌত করিয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন করে; তখন তাঁহার প্রাণে আদেশ আসিল, "তুমি এ উন্নত ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও, পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।" তাঁহার ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু পরমেশ্বরের হুকুম তামিল করিতেই হইবে; তাঁহার প্রাণে অশান্তি উপস্থিত হইল; তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া সংসারে ফিরিয়া আসাই স্থির করিলেন; হৃদয়ের ধড়ফড়ানি চলিয়া গেল, প্রাণে শান্তি আসিল; ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ঈশ্বরের আদেশে নিম্ন ভূমিতে নামিয়া আসিলেন। এখানে আমরা কি দেখিতে পাই? মানুষ যাহা সাধনার দ্বারা, চেষ্টার দ্বারা, ঈশ্বরের কৃপার দ্বারা প্রাণে লাভ করে, তাহা মানব সাধা-রণকে বিতরণ করিতে হইবে; ইহাইত স্বাভাবিক। আমি যদি কোন একটী সুখাদ্য জিনিস প্রাপ্ত হই, তাহা কি আমার প্রিয়জনকে বণ্টন করিয়া দিতে ইচ্ছা হয় না? ইহাইত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ঈশ্বর সেই জন্যই ত মহর্ষিকে আদেশ করি-লেন, যাও, তুমি এখানে যাহা লাভ করিলে তাহা জগতে যাইয়া বিতরণ কর। মহর্ষিও আপনার ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছাতে বিসর্জ্জন করিলেন। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, সাধককে নিয়তই ঈশ্বরের আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়; ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশের জন্য দ্বারদেশে অপেক্ষা করে, যখন যে আদেশ প্রভু করেন 'বিনা বিচারে তাহা তৎক্ষণাৎ পালন করে, সাধককেও সত্যের আলোকের জন্য, ঈশ্বরের আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়; তিনি যখন যাহা বলেন, তাহা তৎক্ষণাৎ পালন করিতে হয়। গুরুদেব

যখন সাধন আরম্ভ করেন তখন তিনি অনাহারে থাকিয়া কত শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া কৃচ্ছ্র সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ছয় বৎসর পরে তাঁহার প্রাণে নূতন আলোক আসিল; তিনি বুঝিতে পারিলেন এ কৃচ্ছ্র সাধনে ফল নাই, শরীরকে কষ্ট দিয়া লাভ নাই। তিনি আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার যে কয়জন শিষ্য ছিল তাহারা গুরুদেবের এই পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া বিরক্ত হইয়া তাহাকে একাকী রাখিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু বুদ্ধদেব তাহাতে বিচলিত হইলেন না, যে আলোক প্রাণে পাইয়াছেন, তাহা ধরিয়া বহিলেন। বুদ্ধের জনৈক জীবন চরিত লেখক বলিয়াছেন যে, অতুল রাজ্যধন, ধনৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্নেহশীল পিতা, প্রেমের প্রতিমা ভার্য্যা, নবপ্রসূত কুমার, ইঁহাদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া সত্যের অন্বেষণে তিনি যে বহির্গত হইলেন, তাহাতে জগতের নিকট তিনি ত্যাগের এক অত্যুজ্জ্বল চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যে সত্যের অনুরোধে স্বীয় অনুসৃত কৃচ্ছ্র সাধনের পথ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন; এখানে তাহার ত্যাগের দৃষ্টান্ত আরও উজ্জ্বলতর। মানুষ অনেক সময় বরং জড়ৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু আপনার পূর্ব্ব পথ ও পূর্ব্ব মত পরিত্যাগ করা তদপেক্ষা অনেক কঠিন। মহর্ষিও হিমাচলে বসিয়া "ব্রহ্ম-ধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ রসপানে জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করিলেন মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ হইল, সংসারে ফিরিয়া আসিয়া যে সত্য রত্ন তিনি প্রাপ্ত করিয়াছেন, তাহা জন-সাধারণকে বিতরণ করিতে হইবে; তিনি অমনি আপনার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সমর্পণ করিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার জয় ঘোষণা করিলেন। আমাদের মনেও ঈশ্বরের বাণী আসে; তাঁহার সুমধুর ধ্বনি পৃথিবীর কোলাহল ভেদ করিয়া আমাদের কর্ণেও প্রবেশ করে, সংসারে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, এখানে কার্য্য করিবার জন্য ঈশ্বরের আহ্বান ধ্বনি প্রত্যেক মানবের নিকটই পৌঁছায়; কিন্তু আমরা তাহা শুনিয়াও শুনি না, অনেক সময় ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিবার অপরাধে প্রাণে যাতনাও আসে; তবুও আমরা সে বাণী শুনি না, আপনাকে নানা যুক্তি-তর্কের আবরণে আবৃত করিয়া সামলাইয়া রাখি। মহর্ষি তাহা করিলেন না; তিনি ঈশ্বরের আদেশ পালন করিয়া, দেশে ফিরিয়া যে অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া ছিলেন, তাহা জগৎকে দান করিবার প্রয়াস পাইলেন। তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইয়া আমরা ধন্য হইতেছি। সেবাই জগতের নিয়ম। যে যাহা লাভ করে, তাহা যদি সে লুকাইয়া রাখে, তবে জগৎ কেমন করিয়া উন্নত হইবে? আজ যদি বৈজ্ঞানিকগণ সত্য সমূহ প্রাপ্ত হইয়া গোপনে লুকাইয়া রাখিতেন তবে কি জগতে এত উন্নতির কথা শুনিতে পাইতাম? কর্ম্ম জগতের নিয়ম, ঈশ্বর মহর্ষিকে যেমন স্পষ্ট বলিয়াছেন, যাও, পৃথিবীতে যাইয়া লব্ধ জিনিস

সকল বিতরণ কর, সেইরূপ তিনি সকলকেই কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছেন। বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে প্রসারিত। কত দুঃখ তাপ, কত পাপ শোক জগতে রহিয়াছে; কত লোক ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে যাইতেছে; কে তাহাদিগকে মধুর বচনে পুণ্যের পথে আনয়ন করিবে? কে তাহাদিগকে শোকে সান্ত্বনা দিবে, দুঃখে অশ্রুজল মুছাইবে, পাপের পঙ্কিল পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবে? কত অজ্ঞানতা, কত কুসংস্কার দেশে রাজত্ব করিতেছে; কে এই সকল দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবে? নিম্ন শ্রেণীর অসংখ্য লোক অজ্ঞান অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে, কে তাহাদিগের নিকট জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিবে, কে তাহাদিগকে হাত ধরিয়া তুলিবে? কত দুঃখ, কত দরিদ্রতা, কত অত্যাচার, কত উৎপীড়ন, কে এই সকল দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবে? তবে বলি মহর্ষির নিকট যে ঈশ্বরের আহ্বান আসিয়াছিল, আমাদিগের নিকটও কি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সেই আহ্বান আসিতেছে না? বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মের যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সুধু ধ্যান ধারণাতে জীবন যাপন করিলে চলিবে না; ঈশ্বরের প্রীতি চাই, তাহার প্রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জন সমাজের সেবাতে নিযুক্ত হওয়া চাই। কর্ম্ম মানুষ নিয়তই করিয়া থাকে, কিন্তু সকল কর্ম্মকেই কি ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করা যায়। মানুষ ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; সেই কর্ম্মই প্রকৃত নরসেবা, যাহা ঈশ্বরের প্রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। মহর্ষি ঈশ্বরের আদেশেই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। হিমালয় যাইবার পূর্ব্বে যে মহর্ষি লোকশ্রেয়ঃ সাধনের চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে। ঈশ্বরের নিকট সাক্ষাৎ ভাবে আদেশ প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত আমরাও যে কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিব, তাহা নহে। তখনও মহর্ষি যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আমরাও তেমনি কর্ম্ম করিব কিন্তু আমাদের লক্ষ্য থাকিবে সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রেমে রঞ্জিত করা। ঈশ্বরের আদেশ পাইবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা ও গভীর সাধনা আবশ্যক। সাধনা না থাকিলে কর্ম্ম করিতে যাইয়া নিজকেই আমরা দেখিব, ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইব না। মহর্ষি হৃদয়ে যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আছে, "তুমি এ উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও" এ কথার মধ্যে গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে; নদী যেমন উচ্চ পর্ব্বতমালা পরিত্যাগ করিয়া নিম্নগামী হয়, সেইরূপ মানবকেও আপনার উচ্চ অবস্থা হইতে অবতরণ করিয়া পাপ তাপ ক্লিষ্ট, শোক দুঃখ ভারাক্রান্ত মানবমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইতে হইবে, ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, ঈশ্বরের সেবাতে ও মানবের সেবাতে ঔদ্ধত্যের স্থান নাই, বিনয়ে অবনত হইয়া জন সমাজের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। প্রকৃত ভাবে সেবা করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিলোপ চাই। অনেক সময়ে যে আমরা নিজেরই গৌরব বৃদ্ধি করিতে চাই, ঐরূপ

কর্ম্মদ্বারা জগতের উপকার হইতে পারে কিন্তু আত্মার কল্যাণ সাধিত হয় না। আপনাকে বিলোপ করিয়া ঈশ্বরের প্রেমে প্রেমিক হইয়া তাহার আদেশে কর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। তাহা হইলে আর কর্ম্মের মধ্যে উচ্চ নীচ থাকিবে না। ভগবানের বিচারে কোন কর্ম্ম উচ্চ, কোন কর্ম্ম নীচ, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? এই বিচিত্রতাময় জগতে ঐ প্রকাণ্ড সূর্য্যের প্রয়োজন আছে, আবার ঐ ক্ষুদ্র শিশির কণারও দরকার আছে; একের কার্য্য অন্যের দ্বারা হয় না; লৌকিক অর্থে আমরা যাহাই বলি না কেন, প্রকৃতপক্ষে ঐ সূর্য্যই বড় না শিশির কণাই বড়,কে বলিতে পারে? উভয়ই ঈশ্বরের করুণা প্রসূত, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রচিত। সংসারে নানাকার্য্যের প্রয়োজন আছে, কোন কার্য্য ছোট, কে বলিবে? ঈশ্বরের প্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার আদেশে যে কার্য্য করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ কার্য্য তাহাই ভগবানের সেবা, তাহা দ্বারাই ভগবানের অর্চ্চনা করা হয়। সুতরাং ধর্ম্ম জগতে কর্ম্মের উচ্চ নীচ ভেদ নাই। ঐ যে বেদীর উপরে উপবিষ্ট আচার্য্য তিনিও ঈশ্বরের সেবা একভাবে করিতেছেন আর ঐ যে রাস্তার মুটে, তিনি ও আর এক ভাবে ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতেছেন। পৃথিবীতে লৌকিকভাবে কার্য্যের তারতম্য করি; কিন্তু উভয়েই যদি ঈশ্বরের প্রেমে অনুরঞ্জিত হইয়া তাহারই আদেশে কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উভয়ের কার্য্যের মূল্যই সমান।

আমরা যে বলিয়া থাকি, তাহার প্রিয় কার্য্য সাধনই প্রকৃত উপাসনা. এই কথা অত্যন্ত সত্য। ইহার একটী হইলে চলে না; প্রীতি চাই, নরসেবাও চাই। মহর্ষি যেমন প্রকৃত ভাবে নরসেবা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমাদিগকেও সেইরূপ সাধনে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। নিজেরা কিছু লাভ না করিলে অন্যকে কি প্রদান করিব? কর্ম্ম পরিত্যাগের জন্য নহে কিন্তু প্রকৃতভাবে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবার জন্য সাধনের প্রয়োজন। তাই বলিতেছি ধর্ম্মের আলোকে আমরা দেখিতে পাইতেছি অনন্ত প্রসারিত কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে; এমন কর্ম্ম নাই যাহা ধর্ম্মের বাহিরে, জীবনের এমন বিভাগ নাই যাহা ধর্ম্মের অভ্যন্তরে নয়। দিনদিনই কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে। কে এই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, কে জীবন সমর্পণ করিবে? মহর্ষির মত কি কেহ ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মানন্দরসপানে বিভোর হইয়া লব্ধ অমূল্য সত্য রত্ন সমূহ মানবকে বিতরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবে? সাধনা চাই; মহর্ষি কি সাধনাই করিয়াছিলেন। দিন নাই, রাত্রি নাই, কেবল ঐ ধ্যান, ঐ জ্ঞান নাকমুখ বন্ধ করিয়া ডুবুরীর ন্যায় তিনি অনন্তদেবের সাধনা সাগরে ডুবিলেন, আর অমূল্য সত্য রত্ন সকল লাভ করিয়া উঠিলেন; সেই সকল রত্নের উজ্জ্বল জ্যোতিতে বিশ্ব সংসার আলোকিত। কি সাধনা, কি নিষ্ঠা, কি সংযম আজ আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্য সাধনায় নিযুক্ত হইতে হইবে।

তাহার প্রীতিতে অনুরঞ্জিত হইয়া সেবাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে; আপনার সুখ দুঃখ তাহার চরণে সমর্পণ করিতে হইবে, তাহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লোকশ্রেয়ঃ সাধন করিতে হইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, এম, এ,

অদ্ভুদ হত্যা কাহিনী।

(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)

—:•:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি তোমার।

একখানি পণ্ড গ্রামের অনতিদূরে নিবিড় অরণ্য, অরণ্যের সম্মুখভাগে একটী পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যানের কিঞ্চিৎদূরে একটী মনোহর অট্টালিকা। এই উদ্যানটী কোন একজন সঙ্গতিসম্পন্ন ভদ্রলোকের প্রমোদ কানন। সুনীল নভমণ্ডলে দিবাপতি ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পশ্চিম গগণে ঢলিয়া পড়িলেন। সুস্নিগ্ধ সমীরণ বহিল। উদ্যানে নানা জাতীয় প্রস্ফুটিত কুসুমনিচয় হাস্যমুখে সৌরভ বহন করিতে লাগিল। জাতী, যুথী, গোলাপ, বেল, রজনীগন্ধ ইত্যাদি ফুটন্ত কুসুমনিচয় হাসিতে লাগিল। সেই বাগানের স্থানে স্থানে আবার ফুলের টব; পুষ্পদলের সুগন্ধ, গন্ধব সহ মিলিত হইয়া, বাগান আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বাগানটী প্রফুল্ল মল্লিকার ন্যায় হাসিতেছে। সেই উদ্যান মধ্যে দুইটী ফুটন্ত মল্লিকার ন্যায় সুন্দরী বালিকা কথোপকথন করিতেছে। প্রথম বালিকাটী বলিল:—দেখ বিমলা দিদি, এই বাগানে এলে আমার প্রাণ দুরু দুরু করে কাঁপতে থাকে! মনে হয়, আর যেন তোমাদের দেখিতে পাইব না; আর মাকেও মা বলে ডাকতে পাইব না। এই বলিয়া সেই ত্রয়োদশ বর্ষীয়া

বালিকাটী স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দ্বিতীয়া বিমলা আপন আঁচল দ্বারা তাহার চক্ষুজল মোচন করিয়া দিয়া বলিল, ছি ছি দিদি! অমন করে কি কাঁদ্‌তে আছে! ছি! দেখ্ তোর কান্না দেখলে আমারও কান্না পায়, তুই কেন কাঁদ্‌লি আমায় বলতে হবে। সে তখন ভয়মিশ্রিতস্বরে বলিতে লাগিল— কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি. আমি যেন বাগানে ফুল তুলতে এসেছি. এমন সময় বাগানের ধারের বন হ'তে মুখে চুন-কালী মাখা কয়েকজন লোক বার হয়ে এসে, আমাকে কাপড় দিয়ে মুখ বেঁধে ধরে নিয়ে গেল। আমি কাতর হইয়া ছাড়াতে চেষ্টা করিলাম, কাকুতি মিনতি করিলাম, কিন্তু কিছুতেই পাপিষ্ঠদের দয়া হ'ল না। শুনিয়া বিমলা বলিল, সেজন্য ভয় কি মালতি। মানুষ কত রকম স্বপ্ন দেখে। বিশেষ স্বপ্ন নিজে দেখলে পরের হয়। দেখ, দেখ দিদি! সুরেন বাবু এ দিকে আসছেন, তা দিদি, আমি এখন যাই।

মালতী। না বোন যেওনা।

বিমলা। না দিদি, আমার ন্যায় চির দুঃখিনী বিধবার আর তোমাদের সুখালাপে কণ্টক হওয়া উচিত নহে, আমি চল্লাম। এই বলিয়া বিমলা নয়ন প্রান্তের এক বিন্দু অশ্রু মোচন করিয়া চলিয়া গেল। এ দিকে সুরেন্দ্র আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মালতি! বিমলা এখানে ছিল না?

মালতী। হাঁ, তোমাকে দেখে বাড়ীর মধ্যে গিয়েছে।

সুরেন। কেন, আমি বাঘ না ভাল্লুক যে তাকে খেয়ে ফেলবো! এই বলিয়া সে লজ্জাবনতমুখী মালতীর হাত ধরিল, বলিল. এস আমারা বাগানস্থিত ঐ শিলাখণ্ডে বসি। এই বলিয়া সুরেন্দ্র ও বালিকা শিলাখণ্ডে উপবেশন করিল। সুরেন্দ্রের চক্ষে আজ মালতীকে যেরূপ সুন্দরী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, তাহার জীবনে সে তাহাকে সেরূপ সুন্দরী দেখে নাই। সে শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে মালতীর প্রাণোন্মাদকারী অনুপম রূপলাবণ্য দেখিতে লাগিল। সে দেখিল, ভ্রমর কৃষ্ণ কেশকলাপ নিতম্ব প্রদেশকে অতিক্রম করিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে; নাসিকা উন্নত তিল ফুলের ন্যায় সরল, আকর্ণ-বিস্ফারিত-নয়ন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূ যুগল নয়নের সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। আরক্তিম গণ্ডস্থল, হাসি হাসি ওষ্ঠ দুখানি তাম্বুলরাগে রঞ্জিত। মৃণাল সদৃশ বাহু যুগলে কঙ্কন, কর্ণে ইয়ারিং, গলদেশে স্বর্ণ হার, পায়ে মল, পরিধান নীলাম্বরী সাড়ী। সুরেন্দ্রের সঘনে নিশ্বাস বহিতে লাগিল, বলিল,মালতী তোমার বেশ বিন্যাসে আজ তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। মালতী চুপ করিয়া রহিল। সুরেন্দ্র পুনরায় বলিল—মালতি। তুমি কি আমাকে ভালবাস? এই বলিয়া সে মালতীর আরও নিকটে আসিয়া উপবেশন করিল। বালিকা লজ্জা পাইল, বলিল তুমি অমন করিলে আমি চলে যাব। সুরেন্দ্র হাসিতে হাসিতে তাহার দক্ষিণ হস্তখানি ধরিল, বলিল, চলে যাবে বৈ কি? আগে

বল আমায় ভাল বাস কি না? মালতী কোন উত্তর প্রদান করিল না, সে লজ্জায় মুখাবনত করিল, তাহার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সুরেন্দ্র পুনরায় কাতর কণ্ঠে বলিল, মালতি! রাগ করো না; আমার কিছু বলিবার আছে।

মালতীমালা বলিল,—'বল'।

সুরেন্দ্র বলিল, রাগ কর্‌বে না ত?

মালতীমালা এবার হাসিল, বলিল—না।

সুরেন্দ্র। আমি তোমাকে ভালবাসি। বালিকা লজ্জায় মুখাবনত করিল, সুরেন্দ্র সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া বলিল,—বল,—আমার প্রতি রাগ করিলে? মালতীমালা উত্তর করিল—না। সুরেন্দ্র তখন বলিল, তবে বল তুমি আমাকে কি ভাল বাস? মালতী-মালা এবার ক্রোধ প্রকাশ করিল—বলিল,—তুমি কি এতদিনেও জান না, আমি তোমাকে ভাল বাসি কি না? তোমার সঙ্গে আমার এ কথা রোজ রোজ আলোচনা কর্‌তে লজ্জা করে, তোমারও কি লজ্জা করে না? আমি জানি, আমি তোমার, আর তুমিই আমার একমাত্র উপাস্য দেবতা,—স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী। এই বলিয়া মালতী আপন আঁচল হইতে একছড়া সুগন্ধযুক্ত ফুলের মালা বাহির করিয়া সুরেন্দ্রের গলদেশে পরাইয়া দিয়া বলিল, আজ হইতে আমি তোমার, আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমার। সুরেন্দ্র তখন পুলকিত হৃদয়ে আনন্দোচ্ছাসভরে মাল-তীকে বাহু-বেষ্টন করিয়া তাহার গণ্ডদেশ চুম্বন-রেখাঙ্কিত করিয়া বলিল,—মালতি! আমি জানি, তুমি আমার ছাড়া আর কারও হবে না, তবু তোমাকে দেখিলে আমি আত্ম বিস্মৃতি হই, তাই কি বল্‌তে কি বলি।

মালতী। তুমি দুঃখ করো না; তোমার যা বল্‌তে হয় বল, আর আমি রাগ কর্‌ব না; তবে আমার কেমন লজ্জা করে তাই তোমার কথার কোন উত্তর করি না, আমার সে দোষ তুমি ক্ষমা করো। সুরেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিল, ক্ষমা আবার কিসের মালতি? সন্ধ্যা হয়েছে, এখন আমি যাই। এই বলিয়া সুরেন্দ্র প্রস্থান করিল। তখন মালতীমালা বিষণ্ণ বদনে তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, যখন সে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তখন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ মনে আপন গৃহাভিমুখিনী হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:০—

অপহরণ।

দিননাথ জগৎ পর্য্যটন করিতে করিতে ক্লান্তদেহে জলধিজলে ডুবিয়াছেন, পবনভরে বৃক্ষপত্র সকল আন্দোলিত হইতেছে, ফুল ফুটিয়া বায়ুভরে দুলিতেছে, পক্ষীগণ মধুর

কলরব করিতেছে, কিছুক্ষণ পরে দুই একটী করিয়া নক্ষত্র নীলাকাশে উদিত হইতেছে. কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবর কোলে পবনের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। দেখিতে দেখিতে রজনীদেবী তাহার মলিন বস্ত্রে জগতকে আবৃত করিলেন। তৎসহ বায়ু ক্রমশঃ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। আকাশে মেঘ উঠিল। অন্ধকার ক্রমশঃ জমাট বাঁধিতে লাগিল। জগত অন্ধকারের সহিত মিলিত হইয়া বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিল। আকাশে মেঘমালা ছুটিয়া ছুটিয়া সকলকে বলিয়া দিতে লাগিল, বর্ষণের আর দেরী নাই। এই ভয়ানক সময়ে একটী নির্জ্জন উদ্যান মধ্যে কয়েকজন মনুষ্য কথোপকথন করিতেছে। প্রথম ব্যক্তি বলিল, এই মেয়ে সেই মেয়ে নয়? বেটীর রূপের ছটা দেখ, রূপেতে অন্ধকারকেও আলো করেছে। কি বল রাম সিং?

রামসিং। আমার ভাই একে বিয়ে করতে বড় ইচ্ছে যাচ্ছে।

৩য় ব্যক্তি। কেনরে, তোর সরোজিনী কি হল?

রামসিং। সরোজিনী এক সময় আমাকে ভাল বাসতো, এখন আর বাসে না, তা একে পেলে চুড়ন্ত চাট হয়।

২য় ব্যক্তি। তা যাই বল, সরোজিনী কিন্তু বড়ই সুন্দরী।

রামসিং। হলে কি হয়, সে আমার হয়ও হল না, যে আমাকে এক সময়ে একমুহূর্ত্ত না দেখলে থাকতে পারতো না সে আর একবারও ফিরে চায় না। সে যদি এখনও আমার হয়, তবে আমি তাকে আমার যথাসর্ব্বস্ব দিই।

৪র্থ ব্যক্তি। আর ছাই, তোরাও যেমন সরোজিনী সরোজিনী করেই মরলি। এদিকে দেখ দেখি কি অন্ধকার হয়েছে। আমাদের যেমন টাকার জন্য প্রাণ দিতে আসা।

২য় ব্যক্তি। তা আমরা কি একটা অন্য কথাও বলতে পারবো না, আর এরূপ কষ্টত আমাদের আর নূতন নহে! তাহারা এরূপ কথোপকথনে নিযুক্ত আছে, এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে সর্দ্দার ধীরে ধীরে সেস্থানে আগমন করিয়া তাহাদিগের হস্তে একখানি রুমাল ও একটী শিশি প্রদান করিল। তারপর বলিল,—তোমরা সকলে মিলে মেয়েটাকে ধরে একবারে আমাদের "হতাশ্বাস" আড্ডায় আবদ্ধ করিও আমি অপরাপর বন্দোবস্ত করিতে চলিলাম। এই বলিয়া সর্দ্দার প্রস্থান করিল। সর্দ্দার প্রস্থান করিবামাত্র ঝী সঙ্কেত করিল, অমনি সয়তানের অনুচর পিশাচেরা তড়িত-বেগে মালতীর উপর ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া পড়িল। ঝীও পলাইল। পূর্ব্ব কথিত রামসিং বলিল, চাঁদের নাকের কাছে রুমাল খানি ধর। এই বলিয়া নরাধমেরা মালতীকে রুমালস্থিত কোন তীব্র গন্ধ দ্বারা অজ্ঞান করিয়া পৃষ্ঠদেশে নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

রাত্রি প্রায় দেড়প্রহর অতীত, ঝড় বৃষ্টি

থামিয়াছে, প্রকৃতি-সুন্দরীর আর সে বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি নাই। এখন প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। ঊর্দ্ধে মেঘ-মুক্ত নীলাকাশে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী-তিথির চন্দ্র নক্ষত্র-রাজির মধ্যে থাকিয়া হাসিতেছে। কুমুদিনী সরোবর কোলে বসিয়া নিশানাথের সহিত প্রেমালাপ করিতেছে। মৃদু নৈশ সমীরণ বহিয়া বহিয়া বহিয়া জগতকে সুশীতল করিতেছে। জুই, মল্লিকা, মাধবীলতা, সেফালিকা, রজনীগন্ধা প্রভৃতি নৈশ প্রস্ফুটিত কুসুম-নিচয়ের সুগন্ধ অনিলের সহিত মিলিত হইয়া সকলকে সুগন্ধদান করিতেছে। (প্রকৃতি-সুন্দরী স্নিগ্ধভাব ধারণ করিয়াছে) সেই সময়ে মালতীর মাতা ঝীকে বলিলেন, খেঁন্তি মালতীকে শোবার ঘর থেকে ডেকে আন্ ভাত খাবে, তার কি খাওয়ার কথা মনে থাকে না।

খেঁন্তি। তার জ্বরভাব হইয়েছে, সে কিছু খাবে না বলেছে, সে শুয়ে আছে।

মাতা। অ্যাঁ জ্বর ! বাছার আমার জ্বর হয়েছে,তা আমাকে এতক্ষণ বলিস্‌নি কেন ? তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আয়। ঝী আর কোন প্রকার দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া অত্যন্ত চঞ্চলভাবে বলিল,—মা সর্ব্বনাশ হয়েছে। সর্ব্বনাশ হয়েছে। মালতী ঘরে নাই ; তাকে সন্ধ্যার সময় বিছানায় ঘুমাতে দেখিয়াছিলাম ; এখন তাকে সমস্ত ঘরে ও বাগানে খুঁজ্‌লাম, কোথাও দেখিতে পেলাম না। ঝীর কথা শুনিয়া গৃহিণী অতিশয় বিচলিত হইলেন, তিনি নিজে একবার গৃহের মধ্যে ও বাহিরে চারিদিকে মালতীমালার অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু কোন স্থানেও সন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি অতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন, তাঁহার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি বজ্রাহতপ্রায় হইলেন, অশ্রু-বিগলিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল ; তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মালতীর পিতা বহির্ব্বাটীতে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, ক্রন্দনের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বাটীর ভিতরে আগমন করিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—গোলমাল কিসের ? তুমি কাঁদিতেছ কেন ? তোমার কি হইয়াছে ? গৃহিণী সম্মুখে স্বামীকে দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া বলিতে লাগিলেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মালতী ঘরে নাই। সমস্ত ঘর বাগা[illegible] কোথাও দেখিতে পেলাম না। ব[illegible] বলিতে তাঁহার নয়ন ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইল। মালতীর পিতা এই আকস্মিক ঘটনায় বুদ্ধি হারাইলেন, তিনি কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অক্ষম হইলেন। কি বলিবেন কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না। তাঁহারও চক্ষু যুগল অশ্রুশূন্য ছিল না। কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিলেন, অ্যাঁ কি বলিলে ? এত রাত্রে মালতী ঘরে নাই। ক্ষেত্রমণি ওরফে খেঁন্তি মনে মনে ভাবিল কি সর্ব্বনাশ ! আমিই ত দুটি সুখী পরিবারের সর্ব্বনাশ করিলাম। আমিই ত সুরেন্দ্রের সর্ব্বনাশ করিয়াছি ! হায়, আমি কি করিলাম ! এদিকে গৃহিণী নানারূপ বিলাপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে

লাগিলেন। মালতীর পিতা তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, তুমি অস্থির হইও না, তুমি স্থির হও, ধৈর্য্য ধর, মালতীকে অন্বেষণ করিতে এখনি লোক পাঠাইতেছি ও পুলিশে খবর দিতেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

পাঠক পাঠিকাগণ। এখনও পর্য্যন্ত কাহার পরিচয় না পাইয়া বোধ হয়, বিরক্ত হইতেছেন? ক্ষমা করুন আমরা একে একে সমস্ত বিষয় বিবৃত করিব। নদীয়া জেলার সন্নিকট কাননপুর নামক একখানি বড় ও বিখ্যাত গ্রাম আছে, গ্রামখানি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বড়ই সুন্দর। এই গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস। ইহা ব্যতীত অন্যান্য নানা জাতির বসতিও আছে। এই গ্রামে দীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন সঙ্গতিপন্ন ভদ্রলোকের বাস, ইনি পূর্ব্বে মুন্সেফ ছিলেন, এক্ষণে পেনসন্ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বগ্রামে অবস্থান করিতেছেন। ইহার পরিবারের মধ্যে, ইহার স্ত্রী ও তিনটি দুহিতা; প্রথমার নাম শশীবালা, দ্বিতীয়ার নাম চারুবালা ও কনিষ্ঠার নাম মালতীমালা, এই মালতীমালার সহিত পাঠক প্রথমেই উদ্যান মধ্যে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বড় দুটী শ্বশুর বাড়ীতেই বাস করে, কনিষ্ঠার আজও বিবাহ হয় নাই। কনিষ্ঠা বলিয়া পিতা মাতা এতদিন তাহার বিবাহ দেন নাই, বিবাহ দিলে সুখের ক্রোড়ে লালিতা পালিতা মালতীকে আর দেখিতে পাইবেন না। এতদিন পরে মালতী পর হইবে, দুঃখের সময় কে তাহাদের দুই একটী মিষ্ট কথা বলিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিবে? ইহাই তাহাদিগের আশঙ্কা; আর তাদৃশ গুণবান্ পাত্রও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এবং বাটীতে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বাল-বিধবা পিতৃমাতৃহীনা একটী শ্যালীপুত্রীও বাস করে, নাম বিমলা। ইহাকেও পাঠক দেখিয়াছেন। এ জগতে তাহার আপনার বলিতে আর কেহ নাই। ক্ষেত্রমনি নাম্নী একজন ঝী আছে তাহাকেও পাঠক মালতীর অপহরণ সময়ে দেখিয়াছেন। রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক একজন খ্যাতনামা ডাক্তারের পুত্রের হস্তে মালতীকে সমর্পণ করিবেন—বাসনা করিয়াছিলেন। ইহার নাম পাঠককে আর নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে কি? ইনিই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সেই সুরেন্দ্র। ইনি এফ, এ, দিয়া মেডিকেল কলেজে পড়িতেছেন, ইহাদেরও বসতি কাননপুর গ্রামে।

ভীষণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে মালতী, দাদা

বলিত! ইহার পৃথক বাটী, মালতীদের বাটীর অনতিদূরে। ভীষণের পিতা দীনেশ বাবুর বাল্য-বন্ধু ছিলেন। দুই জনেই এক-সঙ্গে এক ক্লাসে পাঠ করিতেন, কার্য্যক্ষেত্রেও একস্থানে অবস্থান করিতেন। প্রকৃত বন্ধুত্ব কাহাকে বলে তাহা দীনেশ বাবু ও ভীষণের পিতা উভয়েই অবগত ছিলেন, পরস্পরের প্রকৃতির সমতা না থাকিলে অকপট সৌহার্দ্য সঞ্চারিত হওয়া অসম্ভব। বালিকা মালতী তাহা জানিত না—সে ভীষণকে দাদা বলিয়াই ডাকিত।

ভীষণের নীতি-শিক্ষা আদৌ হয় নাই। সে ফোর্থ ক্লাসের বক্ষে পদাঘাত করিয়া বীণাপাণির সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিল। তাহার স্কুল ত্যাগে শিক্ষকমণ্ডলী হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ভীষণও হাস্যমুখে চেরা সিথী কাটা, ইস্ত্রি করা সার্ট গায়ে দেওয়া, কোঁচা ঝুলান "বকাটে" ছেলের দলে গিয়া প্রবেশ করিল। ক্রমে সে যত বড় হইতে লাগিল, ততই বয়স-দোষের পরিচয় দিতে লাগিল; সে বকাটে ছেলেদের সহিত শিশ দেয়, টপ্পা গায়, হারমনিয়মে সুর দিয়া বাজায়, আর মাছ ধরিবার ছল করিয়া কুল-বধুর অবগাহন অব-লোকন করে। ক্রমে সে একজন গুণ্ডা বলিয়া পরিচিত হইল। তাহার ভয়ে গ্রামের বৌ ঝীরা আর পথে বহির্গত হইতে পারে না। সে মেয়েছেলে দেখিলেই শিশ দেয়, টপ্পা ধরে, বিকৃত অঙ্গ ভঙ্গি করে। কেহ সাহস করিয়া এই সকলের প্রতিবাদ করিতে পারিত না। ভীষণের পিতা ভীষণের এই প্রকার চরিত্র দেখিয়া কতই পরিতাপ করি-লেন, কতই অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন, কতই শিরোদেশে করাঘাত করিলেন, পুত্রকে কতই ভৎসনা করিলেন। ভীষণ যেভাবে কুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে; পিতামাতা তাহাতে বাধা প্রদান না করিয়া তাহার স্বেচ্ছাচারে প্রকারান্তরে উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক চিরদিনের জন্য তাহাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহা পিতামাতার ভালবাসা নহে, প্রত্যুত ইহাকে শত্রুতা বলিতে হয়, এবং এই শত্রু-তার ফলেই তাহাদের বৃদ্ধ বয়সের এই তপ্ত অশ্রুজল। বাল্যকালে কুশিক্ষাবীজ অঙ্কুরিত হইলে সময়ে বিষময় ফল প্রদান করিয়া থাকে; তদ্দ্বারা পিতামাতা আজীবন জর্জ্জরিত হইতে থাকেন, এবং মাতা ও পুত্রধনে রাজ-রাণী হইয়াও ভিখারিণী হইয়া থাকেন ও চিরকাল অশ্রুবিসর্জ্জন করেন। এবং পুত্রেরা কস্মিনকালেও সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না। শিশুকালে কুশিক্ষা প্রদান করিয়া অধিক বয়সে বাধ্য করিবার প্রয়াস যে বিফল হয়। ইহা জানিয়া শুনিয়াও যে জনক জননী শৈশবাবধি সন্তানগণকে সৎপথে রাখিতে এবং বশীভূত করিতে চেষ্টিত না হন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়! জনক জননী তাহাদের স্বভাব অবলোকন করিয়া কত অনুতাপ করেন, অদৃষ্টের দোষ দেন, কিন্তু ইহা মনে করেন না যে, বালকেরা স্বভাব হারায়, ইহা তাঁহাদেরই দোষ। এরূপ স্থলে ভীষণও যে সুশিক্ষার অভাবে কালে একজন গুণ্ডা হইয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চ-র্য্যের বিষয় আর কিছুই নাই! পুত্রের স্বভাব অবলোকন করিয়া ভীষণের পিতা শোকে

দুঃখে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। কিছুদিন পরে পতিগতপ্রাণা স্বাধ্বী স্ত্রীও বৈধব্য-যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য স্বামীর অনুসরণ করিলেন। তখন ভীষণকে আর কেহ কিছু বলিবার রহিল না। মাথার উপর কেহ না থাকিলে যাহা হয় এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সে তখন নির্ব্বিঘ্নে পাপ-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া অসার সুখের হিল্লোলে কালযাপন করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে পিতৃধন খরচান্তে তাহার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইল, দিনান্তে আহারের সংস্থান হয় না। শেষে একদিন দীনেশ বাবুর বাটীতে চুরি করিয়া দুই মাসের জন্য শ্রীঘর গমন করিল। তারপর কারাগার হইতে আসিয়া সে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি।

আগমন।

বীণার মাঝার. আজিকে আমার
উঠেনি মোহন তান,
মধুর প্রভাতে বিশ্বের সাথে,
আমি কি গাহিব গান?
প্রকৃতির আজি সাম-ঝঙ্কারে
গিয়াছে ধরণী ভরি' ওঙ্কারে:
আমারি ছন্দ, আমারি মাঝারে
মিলা'য়ে দিয়েছে প্রাণ;
মধুর প্রভাতে বিশ্বের সাথে,
আমি কি গাহিব গান?
পুরাণ ভাঙ্গিয়া, নবীন গড়িয়া
আজিকে প্রকৃতি বালা,
এসেছে তোমার মন্দির দ্বার,
গাঁথিয়া কুসুম মালা।
তোমারি নিবিড়-কানন মাঝারে,
তোমারি বিজন সাগরের পারে,
তব মন্দাকিনী সরযুর ধারে,
করিয়া ভুবন আলা,
অঞ্জলি তব চরণে আজিকে
দিতেছে প্রকৃতি বালা।
আজিকে তটিনী, মধুর ভাষিনী
মঙ্গল-বাণী ল'য়ে
গৌরব-বাহিনী, অতীত-কাহিনী
শুনায় সঙ্গীত গেয়ে,
গাহে ব্যোম নিতি, বিজয়-ভারতী;
প্রকৃতি নিতুই করেগো আরতি
আমার হৃদয়ে শুধু প্রতি নিতি
উঠে হাহাকার ল'য়ে
বিষাদ-মলিন, তপ্ত-হুতাশ,—
জীবন যায়গো বয়ে!
কে যেন গো ছিল, হৃদয় জুড়িয়া;—
আজি সে গিয়াছে চলি:

যত সজীবতা, যত সুন্দরতা
গেল তার সাথে ছলি'।
হৃদয়ে অনন্ত জ্বলেছে শ্মশান,—
করেছি আহুতি ক্ষুদ্র পরাণ,
বৈতরণী-তীরে ল'য়ে ভাঙা গান,
আজিকে এসেছি দলি'—
বিশ্বের শত বিষাদ-বেদন
আশ্বাস ক্ষীণ ভুলি!

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

আমাত্ব।

—০ঃ০—

আমাব আমার বলি বরি অহঙ্কাব।
যা দেখি সকলি বলি আমাব আমাব॥
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী আদি পবিবার।
সুতা সুত সিমন্তিনী সকলি আমাব॥
ভাবিনা কদাচ চিতে সকলি অসাব
নিশ্চিত যাইতে হবে তাজিয়া সংসাব॥
কভু তো ভাবিনা মনে ছেড়ে যেতে হবে।
ভাবি সদা এই ভাবে রব এই ভবে॥
যদি কেহ বলে "এই ভবন কাহার"।
তখনিই বলি তাবে "আমার আমাব"॥
ব্রহ্মাণ্ড আমাব বলি পরিতৃপ্তি নাই।
আমাব বলিতে যেন আব কিছু চাই॥
যা আছে নাহিক যেন পূর্ণতা তাহার।
আর কিছু হলে ভাল হইত আমার॥
মাসেতে হাজাব দশ পাই যে বেতন।
তবুও ধনাশে মন সদা উচাটন॥
অনেকের হতে মম অর্জ্জন প্রচুর
তবুও অভাব কেন নাহি হয় দূর?
কভু তো ভাবিনা চিতে সব মায়াজাল।
যতন করিয়া তবু বাড়াই জঞ্জাল॥
মাতিয়া অনিত্যে না স্মবিয়া নিত্যধন।
ধন ধন ধন কবি ধাই অনুক্ষণ॥
পূর্ণিত সুহৃদবৃন্দে বাহিব ভবন।
চাটু ভাষে সুধাইছে আছেন কেমন॥
হরণ পূরণ দাতা যেই সারাৎসাব।
যাহাব ইঙ্গিতে চলে এ বিশ্ব সংসাব॥
তাঁহাব মধুব নাম কবি উচ্চাবণ।
হেন অবকাশ মম ঘটে না কখন॥
অকৃতজ্ঞ অপবাধী পাতক প্লাবিত।
ঈশ্ববের প্রিয় কার্য্য সাধন-কুণ্ঠিত॥
যবে এই প্রাণ-পাখী ত্যজিবে বাসায়।
চক্ষু স্থিব হবে বায়ু না ববে নাসায়॥
কৃতান্ত কিঙ্কব আসি কেশ আকর্ষণে।
পীড়ন কবিবে যবে নানা প্রকরণে॥
ধন বল জন বল ঐহিক সম্বল।
করী, বাজী, ভোজ-বাজী বিভব সকল॥
কিছুতেই অধিকার না রবে তখন।
কভু তো ভাবি না মনে সে দিন কেমন॥
নিবীড় তিমিরাবৃত অজ্ঞাত প্রদেশে।
অলক্ষিতে লবে বাঁধি সুকঠিন পাশে॥

জীব পরিণাম এই হয় সাধারণ।
হেন মহা মোহে মুগ্ধ প্রায় সর্ব্বজন॥
দুচ্ছেদ্য, দুর্ভেদ্য, জাল করিতে ছেদন।
চৈতন্য সায়ক মাত্র প্রধান সাধন॥
সে সায়ক সঞ্চালনে যেই জন পাবে।
কলুষশরণী ত্যজি পুণ্য পথ ধরে॥
ঈশ্বরে বিশ্বাস আর পর উপকার।
পর হিতে প্রাণপাত করে আপনার॥
সেই সে দেবতা বটে নর কলেবরে।
সারাৎসারে তুষিবারে সেই শুধু পারে॥
আমার কিছুই নয় সংসার অসার।
কেবল আমার সেই সংসারের সার॥

শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষ।

আবর্ত্ত।

[ক্ষুদ্র গল্প।]

১

উপর্য্যুপরি তিন তিনবার বি-এ পরীক্ষায় ফেল হইয়া যতীন যে অফিসে কেরাণী হইয়া ঢুকিল, অল্পদিনের মধ্যেই তথাকার বড় সাহেবের নেক্‌নজর তাহার উপর পড়িল পৃষ্ঠপোষকতা, পদোন্নতি এবং বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহেবিয়ানার খানা তাহার বিকৃত মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল, এবং লুকাইয়া লুকাইয়া সে যে তামাকু-সেবন-টুকু অভ্যাস করিতেছিল—একদিনে তাহা ছাড়িয়া দিয়া কড়া বর্ম্মা চুরুট হইতে ধূমোদ্গীরণ করিতে লাগিল।

পূজার ছুটীতে শ্বশুর বাটী গিয়া যতীন দেখিল যে তাহার বালিকা-পত্নী অতিমাত্র লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া তাহার সহিত ভাল-রূপ বাক্যালাপ করিতে পারিতেছে না। যদি চ সে মনে মনে স্বীকার করিত যে লজ্জা স্ত্রীজাতির একটা শোভা বটে, তবুও সে শোভার এতটা আতিশয্য তাহার ভাল লাগিল না। অপরের সমক্ষে লজ্জা মন্দ নহে, কিন্তু স্বামীর নিকট এত লজ্জা যে, অর্দ্ধেক কথাই বোঝা যায় না! যতীন মনে করিল—নিজের স্ত্রীকে সে নিজেই accomplished করিয়া লইবে!

কয়েকদিন ধরিয়া পত্নীকে সে বিস্তর উপদেশ দিল। বালিকা উপদেশের মর্ম্ম কতটা গ্রহণ করিল জানি না, কিন্তু সেই চ'খে চ'খে চক্ষু মুদিয়া ফেলা রোগটা কথঞ্চিৎ কমিতে দেখা গেল, এবং অর্দ্ধস্ফুট ভাষাও ক্রমে স্ফুটতর হইয়া আসিল।

পূজার ছুটীর পর অফিস খুলিলে বড় সাহেবকে রোগে ধরিল। সাহেব ছুটী লইয়া মুসুরি পাহাড়ে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গেলে অফিসের ছোট সাহেব যতীনের পক্ষে বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইল। প্রত্যহ খুঁটি-নাটী ঘটনার জবাবদাহি করিতে করিতে প্রাণান্ত হইয়া সে ভাবিল—বড় সাহেব শীঘ্র

ফিরিয়া আসে ভালই, নচেৎ তাহার চাকরী টুকুর পরমায়ু ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু বড় সাহেব আর ফিরিল না— মুসুবি হইতেই জবাবদাখিল করিয়া বিলাত প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল।

এই সংবাদ পাইয়া যতীন একবারে গিয়া বড় সাহেবের সহিত দেখা করিল, বলিল,—সাহেব তুমি চলিয়া গেলে ওঅফিসে আমার আর পোষাইবে না, অন্যত্র কোথাও আমার একটা চাকরীর যোগাড় করিয়া দিয়া যাও। সাহেবটী বৃদ্ধ হইয়াছিল। নিজের কোন সন্তানাদি না থাকায় অনুগত বাঙ্গালীর ছেলেটীর প্রতি তাহার হয়ত একটু মায়াও জন্মিয়া থাকিবে; অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বলিল—What shall I do for you—they are all hungry wolves.

যতীন কিছুতেই ছাড়িল না—বলিল, একটা উপায় করিয়া দিতেই হইবে।

তখন সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল— এক কাজ করিতে পারিবে?—আমার সঙ্গে বিলাত যাইতে পারিবে?

কথাটা শুনিয়া যতীন চমকিয়া উঠিল, অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—সেখানে গিয়া কি করিব?

"কেন ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিবে।"

ব্যারিষ্টার! যতীন বিস্ফারিত নয়নে চিন্তা করিতে লাগিল। সাহেব বলিল তোমার কোন চিন্তা নাই, সমস্ত খরচ-পত্র আমি নিজ হইতেই দিব। তুমি মন স্থির কর, পরে আমাকে জানাইও।

যতীন ধীরে ধীরে কহিল—আমাদের একটা Prejudice আছে বিলাতে গেলে জাত যায়। সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—এই জন্যই তোমরা অন্য জাতির ক্রীতদাস!

সাহেবের এ রূঢ়তা যতীন সহ্য করিতে পারিল না; উত্তেজিত স্বরে কহিল আমি যাব।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই আফিসের লোকেরা জানিল যে যতীন বাবু কর্ম্মে ইস্তফা দিয়াছে।

২

বৃদ্ধা মাতা, শ্বশুর এবং শাশুড়ী কেহই যতীনকে নীরস্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিস্তর বুঝাইলেন, অনেক কাঁদা-কাটা করিলেন—কোন ফল হইল না। যতীন বিছানার মোট বাঁধিয়া ফেলিল।

যখন সে শশুড় বাটীতে উপস্থিত হইল, তখন শাশুড়ী কন্যার হাত ধরিয়া বলিলেন— বীণা! তুই যদি জামাইকে বুঝিয়ে শুজিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারিস্। আর অন্য উপায় নাই —লজ্জা করিস্‌নে—লজ্জার সময় এ নয়!

মার কথা শেষ হইতে না হইতে লজ্জায় বীণার কপোল-দেশ রঞ্জিয়া উঠিল।

তা, সে রাত্রিতে যখন বীণার উষ্ণনিশ্বাসে তাহার নোলকের মুক্তাটী ঘামিতেছিল, এবং যতীন অকারণে তাহা খুঁটিতেছিল, তখন বীণা ধীরে ধীরে কহিল—সবাই বারণ কচ্চেন, তুমি কি একান্তই যাবে?

বিলাত গমনোদ্যত ভাবী ব্যারিষ্টার

ওজস্বিনী ভাষায় বুঝাইয়া দিল—যে বিলাত না গেলে মানুষ হওয়া যায় না,এ দেশে যে চাকরী পাওয়া যায়, তাহার অপেক্ষা মোট বওয়া অনেক ভাল। বুঝাইল যে, জাতি সামগ্রীটা যাহা হইতে একবার জন্মান গিয়াছে, যে যাই বলুক না কেন না মরিলে তাহা নষ্ট হইবার নহে। বীণা ছেলে মানুষ, তাহার উপর লেখাপড়া শেখে নাই, তাই অত কথা সে বুঝিতে পারিতেছে না; যদি একটু লেখাপড়া শিখিত, তাহা হইলে সে সহজেই বুঝিতে পারিত তাহাকে আর অত করিয়া বোঝাইতে হইত না।

বীণার বিদ্যার দৌড় বোধোদয়ের খান কতক পাতা পর্য্যন্ত। এ কারণ বি-এ ফেল স্বামীর নিকট সে বেচারা বড় সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত। কিন্তু সে হটিবার পাত্রী নহে। লেখাপড়া শিখিয়া স্ত্রীলোকেরা কি হইয়া থাকে, তাহা যদিচ তাহার বোধ শক্তির অতীত, তথাপি বোধোদয় পর্য্যন্ত বিদ্যা লইয়াই সে তাহাদের সমকক্ষ হইবার বাসনা রাখে। তাই বিদ্বান স্বামীর কথা গুলা তাহার অসঙ্গত বোধ হইল না এবং সকল কথাই সে শিক্ষিতার ন্যায় বুঝিয়া ফেলিল।

যদিবা বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে উচিৎ অনুচিৎ তর্কটা থাকিল, তবে ভাবী বিরহের আশঙ্কাটা তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। বুঝি যতীনের সমস্ত দৃঢ়তা বাণের জলে বাঁশ-পাতার ন্যায় ভাসিয়া যায়। বীণা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—কত দি[illegible]যে দেখ্তে পাব না!

অশ্রুসিক্ত লোলকপরা মুখ খানির প্রবল আকর্ষণের সহিত ভবিষ্যতের উচ্চ আশার তুমুল মোকদ্দমা বাধিয়া গেল। এবং ভাবী ব্যারিষ্টার বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে কোনসূত্রে তাহার নিষ্পত্তি করিবেন ঠিক করিলেন।

তখন খোলা জানালা-পথে পাতলা মেঘ ঢাকা চাঁদের অস্পষ্ট আলো আসিয়া শয্যার উপর পড়িয়াছে। ঠাকুরঝিরা যে বেলফুল ছড়াইয়া দিয়াছিল, তাহারই স্নিগ্ধ গন্ধ নেটের মশারির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিল। যতীন আদরের সহিত ডাকিল—বীণা!

বড় বড় চক্ষুদুটীর ফুলা পাতা লইয়া বীণা স্বামীর মুখপ্রতি চাহিল। মনে হইল, এই মুখখানি কতদিন দেখিতে পাইব না। কতদিন? তিন বৎসর! ৩৬০ দিনে এক বৎসর,তিন বৎসরে এক হাজার আরো কত দিন হয়—তাহা যদিও বীণা ঠিক করিতে পারে না, তথাপি ইহা নিশ্চিত যে অত দীর্ঘকাল সে না দেখিয়া থাকিতে পারিবে না,—কিছুতেই না! বালিকার আঁখিপাতা ভিজিয়া গেল।

যতনী আবার ডাকিল--বীণা! বীণা কম্পিত কণ্ঠে কহিল—কি?

যতীন ধীরে ধীরে তাহার মুখখানি স্বীয় বক্ষের উপর রাখিল; বলিল—একটী কাজ যদি করতে পার তা হলে সব ঠিক হয়। তা হলেই তোমার বা আমার কোন কষ্ট হয় না। পারবে?

বীণা মস্তকোত্তলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি করতে হবে?

তখন যতীন তাহাকে বিস্তর বোঝাইল যে শিক্ষিতা নয় বলিয়াই সে বুঝিতে পারিতেছে না, যে স্বামীই তাহার একমাত্র ধর্ম্ম, তাহার স্ত্রী-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাহার সর্ব্বস্ব। স্বামীর তুলনায় পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলেই নিতান্ত পরমাত্র। স্বামী বনে গমন করিলে স্ত্রীকেও তাহার অনুসরণ করিতে হয়—যে না করে সে অতিশয় নিকৃষ্টা সন্দেহ নাই। সেই স্বামীর সহিত বিলাতে গেলে কেমন হয়? বন নয়, জঙ্গল নয়, পৃথিবীর অমরাবতী বিলাতে যাইতে বীণার কি ক্ষতি?

প্রথমে অবশ্য বীণা হাসিয়া প্রস্তাবটা উড়াইয়া দিল। দুঃখের সময় একবার হাসিলে পরক্ষণেই দুঃখ বাড়িয়া উঠে। বীণার তাহাই হইল। যখন যতীন পাশ ফিরিয়া শুইল, তখন বীণা কেবলই "কি ক্ষতি" এবং "কেমন হয়" ভাবিতে লাগিল। বহুক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে যতীনের উপদেশ মত সে বুঝিতে পারিল,—স্বামীই তাহার সর্ব্বস্ব, লোকলজ্জা বা অপর কোন বন্ধনের সহিত স্বামীর তুলনা হইতে পারে না। বোধোদয় তাহার বোধের উদ্রেক করিয়া দিল। তখন সে কোন বিশেষ 'ক্ষতি' দেখিল না এবং "কেমন হয়" সম্বন্ধে মন্দ হয় বলিয়া তাহার মনে হইল না।

তখন ভোরের চন্দ্র ম্লান হইয়া আসিয়াছে নিকটস্থ আম্রশাখায় পাখীর পাখার ঝটপট্ শব্দ শোনা যাইতেছে এবং স্নিগ্ধ পবন জানালার খড়খড়ীর পথে ঝিরঝির করিয়া বহিয়া আসিতেছে। বীণা কেমন করিয়া লজ্জার মাথা খাইয়া স্বামীকে বলিল—"ওগো আমি তোমার সঙ্গে যাব" এবং কেমন করিয়া তখনই এই দম্পতির পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল—তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু সেই নিশি অবসান হইবামাত্র যতীন শ্বশুরের নিকট বীণাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—মার সেবাশুশ্রূষার জন্য আমি তাহাকে সেইখানে রাখিয়া যাইতে চাই।

শ্বশুর মহাশয় কি ভাবিলেন তাহা জানি না, দুই একবার আপত্তি করিয়াই তিনি সম্মত হইলেন।

৩

বড় সাহেবের সঙ্গে কথা ছিল সে বম্বে গিয়া অপেক্ষা করিবে—যতীন কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইবে।

ব্রাহ্মিকা ধরণে সজ্জিতা বীণা এবং প্যাণ্টধারী যতীনকে লইয়া বি, এন, রেলওয়ের বম্বে মেলখানা যখন ভিক্টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেশনে পৌঁছিল, তখন প্রভাত হইয়াছে। তরুণ সূর্য্যের নবীন আলোকরাশি বাহিরে ঝক্‌মক্ করিতেছে, কিন্তু ষ্টেশনের ভিতর প্রায় অন্ধকার। বাতিগুলা সব নিভাইয়া দিয়াছে, ক্বচিৎ দুই একটা জ্বলিতেছে মাত্র। বীণা এত বড় ষ্টেশন কখনও দেখে নাই; এখন তাহার ভয় হইতে লাগিল—না জানি বিলাত বা কেমন দেশ হইবে। প্ল্যাটফরমে অত্যধিক জনতা,

অধিকাংশই লালমুখ। তাহারই মধ্যে বীণাকে একপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া যতীন গাড়ী ঠিক করিতে গেল। নতমুখে নত-নেত্রে দাড়াইয়া একান্ত সঙ্কুচিতা বীণার বুকের মধ্যে সেই বিপুল জনতার প্রতিধ্বনি গুম্ গুম্ করিতে লাগিল—আর প্রতিক্ষণেই তাহার মনে হইতে লাগিল—আর বিলাতে গিয়া কাজ নাই, দেশে ফিরিলেই ভাল হয়।

তথাপি তাহাকে যাইতে হইবে। যাহার জন্য পিতামাতা ভাই, ভগ্নী, চিরপরিচিত গৃহ সংসার ছাড়িয়া বিনা আপত্তিতে এতদূর আসিয়াছে, তাহারই হাত ধরিয়া এখনও কত সমুদ্রের উপর দিয়া রেলের উপর দিয়া, কত পাহাড় পর্ব্বত, নদনদী অতিক্রম করিয়া কত বনস্থলী ভেদ করিয়া কত দূরে কোন এক অচিন্ত্য মহানগরীর, কোন অপূর্ব্ব স্থানে তাহাকে যাইতে হইবে তাহা সে কল্পনা করিবার আগেই একটা লেডী টিকিট-কলেক্টর আসিয়া তাহার টিকিট দেখিতে চাহিল। তাহার ভাষাও বীণার বোধগম্য নহে এবং টিকিটও তাহার নিকটে নাই। সে মহা বিপদে পড়িল।

যতীনের ভাগ্যচক্রের গ্রহগণ এই সময় যে কোন রাশিতে অবস্থিত ছিল তাহা বলা যায় না, কিন্তু সেও নির্ব্বিঘ্নে ফিরিল না। সেদিন একটা পরব থাকায় ষ্টেশনে যথেষ্ট গাড়ী ছিল না। চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে যতীন বহু কষ্টে একখানা গাড়ী সবে মাত্র সংগ্রহ করিয়াছে, এমন সময়ে মেম সমভিব্যাহারে এক সাহেব আসিয়া তাহা দাওয়া করিয়া বসিলেন। কোচম্যান যতীনের মুখ প্রতি চাহিল। যতীন সাহেবকে বলিল—যে গাড়ীখানা ইতিপূর্ব্বে সে ভাড়া করিয়াছে। সাহেব উত্তর দিল যে তাহার সঙ্গে লেডী আছে অতএব বাবু অন্য গাড়ীর চেষ্টা দেখিলে সে সুখী হইবে। যতীন জানাইল যে তাহার লেডী তাহারও সঙ্গে থাকায় সাহেবের সুখের সম্ভাবনা নাই।

এতটা সমান উত্তর শ্বেতাঙ্গের সহ্য হইল না, একটা অকথ্য কথা প্রয়োগ করিয়া যতীনকে ধাক্কা দিল। যতীনও তাহাকে বিবাদীর ওজন ইয়ত্তা করাইয়া দিল। রীতিমত হাতাহাতি বাধিতে না বাধিতে আরক্ত বদন পুলিশের আবির্ভাব হইল; ফলে সাহেবটা মেমকে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া চুরুট ধরাইল। যতীনের মুখ হইতে চুরুট খসিয়া পড়িল এবং সে যে তিক্ত ব্যবহার প্রাপ্ত হইল, তাহাতে তাহার বোধ হইল যেন সমগ্র ষ্টেশন যাথ বম্বে সহরটা পর্য্যন্ত ঘুরিতেছে। তাহার জীবনে এরূপ কখন ঘটে নাই, সৌভাগ্য, যে পরিচিত কেহ উপস্থিত ছিল না।

ইতিমধ্যে বীণার নিকট হইতে টিকিট না পাইয়া লেডী তাহাকে ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মা করিয়া দিয়াছে—সে সেইখানে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে; প্ল্যাটফরমে আসিয়া স্ত্রীকে দেখিতে না পাইয়া যতীন তখনই পাগলের মত ছুটাছুটী আরম্ভ করিয়া দিল এবং বহুক্ষণ পরে সন্ধান পাইয়া কষ্টকষ্টে তাহাকে উদ্ধার করিল।

স্বর্গের সিঁড়ির একপদ মাত্র উঠা হইয়াছে, এখনও বিস্তর বাকী। কিন্তু এই খানেই বিপদের উপর বিপদে পড়িয়া যতীন এতই নাকাল হইল যে তাহার অন্তরাত্মা কেবলই বলিতে লাগিল—আর স্বর্গে গিয়া কাজ নাই, নামিয়া পড়াই মঙ্গল।

বীণার সহিত যখন সাক্ষাৎ হইল তখন তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইতেছে। যতীন সান্ত্বনা সহকারে তাহাকে থামাইয়া সঙ্গে আসিতে বলিল।

কলের পুতুলের ন্যায় বীণা তাহার অনুসরণ করিল। সেই বৃহৎ লোকারণ্যময় প্রতিধ্বনি-সজাগ গম্ভীর-ষ্টেশন হলে যতীনের হস্তখানি ছাড়া তাহার আর কিছুই ছিল না, সে নতমুখেই চলিল। এবার অতি সহজেই গাড়ী জুটিয়া গেল। গাড়ী ছাড়িলে বীণা দুই পার্শ্বের খিড়কী উঠাইয়া দিল, যতীন তাহার বিষয় জানিতে চাহিলে সে কোন উত্তর দিল না। যতীন খিড়কী ফেলিয়া দিতে গেলে সে বাধা দিল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যতীন বসিয়া রহিল। যদিও নিজের দুর্গতির কথা স্ত্রীকে জানাইতে বেচারীর সাহস হয় নাই, তথাপি পাছে তাহার হৃদপিণ্ডের সজোরে আঘাত বীণা শুনিতে পায় এই ভয়ে সে অস্থির হইল। বাস্তবিক সে হৃদপিণ্ড বড় জোরেই আঘাত করিতেছিল, শুধু দুঃখ এবং অভিমানে নহে, সেই সঙ্গে অনুতাপের মিশ্রণ! ইহারই ফলে তাহার জ্ঞান নেত্র উন্মীলিত হইল। রাংতার জৌলস বর্জ্জিত হইয়া গেল—প্রকৃত রত্নের উজ্জ্বলশ্রী বিকাশ পাইল। প্রতি নিশ্বাসে তাহার মনে হইতে লাগিল কি ভীষণ আবর্ত্তের মধ্যেই পড়িয়াছিলাম। কোথায় ভাসিয়া যাইতেছিলাম। আর ভাসিব না—দেশে ফিরিব। যে দেশে আটকোটী লোকের অন্ন জুটিতেছে, সেথানে আমারও কি জুটিবে না?

গাড়ী যথা সময়ে নির্দ্দিষ্ট টেম্পলবার হোটেলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। যতীন কোচম্যানকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, বীণা ছলছল নেত্রে বলিল—তোমার দুটী পায়ে পড়ী আর আমাকে একলা ফেলে যেও না! কি মর্ম্মভেদী কাতরতা! যতীনের অন্তঃকরণ বিগলিত করিয়া দিল—ভাবী ব্যারিষ্টার মোট বহিতে প্রস্তুত হইল; সস্নেহে বীণার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল—তোমার কোন ভয় নাই আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরিব।

এসপ্ল্যানেড্ রোডটী বড় সুন্দর স্থান, দেখিবার যোগ্য বটে। গাড়ীতে একলা বসিয়া থাকিতে বীণার ইচ্ছা হইল—একবার গলা বাড়িয়া দেখে। কিন্তু যতীনের অনুপস্থিতে কাজটা কিছুতেই সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না—সে স্বামীর অপেক্ষা করিতে লাগিল। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, বড় সাহেবের সঙ্গে যতীন ফিরিয়া আসিল। সাহেব আসিয়াই বীণার ক্ষুদ্র হাতখানি নাড়িয়া দিয়া একটা ফুলের তোড়া উপহার দিল। সাহেব প্রবীণ হইলেও হস্ত নাড়াটা বীণার আদৌ ভাল লাগিল না।

হোটেলের ত্রিতলে এক কার্পেট মণ্ডিত প্রকোষ্ঠে তাহাদিগের স্থান হইল।

৪

পরদিন প্রাতরাহারের পর যতীন বলিল আর বিলাত যাইব না—আজই দেশে ফিরিব। প্রাণভরা সন্তোষে বীণার মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

বৈকালে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যতীন বলিল সাহেব আমি ব্যারিষ্টার হইতে চাহিনা, আজই দেশে ফিরিব। সাহেব অতিমাত্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কি বলিতেছ ?

যতীন। দেশে মোট বহিতে হয় সেও ভাল, ব্যারিষ্টার হওয়ার জন্য আমি বিলাত যাইব না—আজ রাত্রেই দেশে রওনা হইব।

সোৎসুক সাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যতীন অপকট হৃদয়ে সমস্তই বলিয়া ফেলিল। সহানুভূতি জানাইবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও সাহেবের সে অবসর আসিল না। —বীণাপানির পরিচয় পাইয়াই সে বিস্মিত হইয়া যতীনের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, পরে বলিল—Your wife !—God bless her !—But what made you bring with ?

যতীন কিছু ফাঁপরে পড়িল। যখন দূর বঙ্গদেশের মাঝখানে জ্যোৎস্না রাত্রিতে বেল ফুলের গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে এই প্রস্তাবটা হইয়াছিল, তখন এ 'কেন'টু কতটুকু তাহাদের মনে আসিয়াছিল ? বিরহাশঙ্কার যেটুকু অভিনয় হইয়াছিল তাহা কাহার ভাগ্যে না ঘটিয়া থাকে ? তথাপি তাহা নিবারণের আশায় যতীন এই অসীম সাহসিক কার্য্য করিয়াছে। বীণা ত' তাহার খেলিবার পুতুল মাত্র, তাহাকে যেমন বুঝাইয়াছে সে তেমনই বুঝিয়াছে—স্নেহময় সামগ্রীটী তাহারই ইচ্ছামত ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া যতীন কহিল—সে আপনা হইতে আমার সঙ্গে আসিয়াছে, আমার কেহ অভিভাবক না থাকায় তাহাকে আনিতে বাধ্য হইয়াছি।

যতীনের উপর সাহেবের কিছু মমতা জন্মিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল—কেহ অভিভাবক নাই ?

"তুমি ছাড়া আর কেহই নাই" মিথ্যা কথাটা বলিতে যতীনের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হইল না। "অ'রাইট দেখা যাউক কি করিতে পারা যায়" বলিয়া সাহেব প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পর তথায় ফিরিয়া আসিয়া সাহেব কহিল—This much I can do for you. আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুর নামে পত্র দিতেছি, পত্রখানা লইয়া যাও। মাসে আড়াই শত টাকা মাহিনা পাইবে—তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিও। ভরসা করি তোমরা সুখী হইবে। যতীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইল না।

সংবাদটা শুনিয়া বীণা বলিল—সেই মুসুরী পাহাড় থেকে দিলেই ত ভাল হ'ত, এত ভোগ আর তা হ'লে ভুগতে হ'ত না।

সেই রাত্রেই যাত্রীপ্রবাহের মধ্য দিয়া তাহারা কলিকাতার ডাকগাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

যে আবর্ত্ত তাহাদিগকে এত দূরে লইয়া আসিয়াছিল, সেই আবার কূলে তুলিয়া দিল।

৫

ট্রেনে দুই রাত্রি কাটিয়া গেল।

যাত্রাকালে উদ্দীপনার প্রাচুর্য্যে কোন চিন্তাই যতীনের মনে স্থান পায় নাই, কিন্তু এখন তাহার মনে হইতে লাগিল— যে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছিলাম—তাহা বড় সুন্দর, বড় মনোরম, এমন দেশ বুঝি আর পৃথিবীর কোথাও নাই। বুঝি কোন একটা কাল্পনিক আলোকের ছটায় এ কৌস্তভ মণির বিমল জ্যোতি এতক্ষণ তাহার চক্ষে আসিয়া পড়ে নাই। আজি প্রাতঃকালে যখন গয়া ষ্টেসন ছাড়াইয়া গেল, উদিতমান সূর্য্যালোকে চারিদিকের পাহাড়, শ্যামল বনরাজী, বিষ্ণু মন্দীরের স্বর্ণচূড়া, স্বর্ণপতাকা জ্বলিতে লাগিল, তাহারই পানে চাহিতে চাহিতে এক অপূর্ব্ব পুলকে যতীনের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। গাড়ীর চাকা যে দেশের উদ্দেশে দ্রুত ঘুরিতেছিল যতীনের হৃদয় সেই দেশ পানেই ছুটিয়া চলিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই দেশেরই চির পরিচিত ফুলটি, ফলটি, গাছের পাতা পবন হিল্লোলে দোদুল্যমান লতিকা, তাহাতে কুসুম মঞ্জরী, অরুণালোকে বহির্জগতের ছবিখানি, সান্ধ্যচিত্র, স্বর্ণমেঘ, নীলাকাশ, উড্ডীয়মান বিহঙ্গম, চন্দ্রোদয়, জ্যোৎস্নাস্নাত জগত, নদীহৃদয় তাহাতে নক্ষত্র চন্দ্রমার প্রতিবিম্বরাজী সকলই তাহার মনশ্চক্ষের সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল, পাখীর গান, নদীর কল্লোল পত্রের মর্ম্মর, বাঁশীর রব, যেন সে এক কালে শুনিতে পাইল। সমস্ত হৃদয়খানি তাহারই প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

গোমো জংসনে একদল স্বেচ্ছাসেবক মাথায় হলদে পাগড়ী বাঁধিয়া পাশের ইণ্টার ক্লাসে উঠিল এবং গাড়ী ছাড়িয়া দিলে সমস্বরে গান ধরিল :—

তোমায় ভাল বাসি।
আমার সোণার বাংলা আমি তোমায়
ভালবাসি।

গানের প্রত্যেক পদটী, প্রত্যেক কথাটী যতীনের মর্ম্মে প্রবেশ করিতে লাগিল। সে শুনিতে থাকিল,—

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী॥

দ্রুতগতিতে মেল চলিয়াছে—দুই পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতকন্দরে গানের প্রতিধ্বনি হইতেছে। যতীনের হৃদয় তন্ত্রীতে তাহারই সুর বাজিতেছে। সে ভাবিতে ভাবিতে চলিল। ভাবিতে ভাবিতে আসমুদ্র হিমাচল একটী মাতৃমূর্ত্তি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল; কি অপার মহিমা, কি অসীম করুণা, কি অগাধ স্নেহ! প্রাণ ভক্তিরসে ভরিয়া গেল— সে জোড় করে তৎপ্রতি নমস্কার করিল।

উদ্দাম বায়ুতে একটী কেশগুচ্ছ আসিয়া কেবলই বীণার শুভ্র কপোলের উপর পড়িতেছিল—সেও একদৃষ্টে নীরবে স্বামীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

আমি।

আমার অপূর্ব্ব রাজ্য আপন হৃদখানি—
হাস্তময়ী আত্মাবধূ—সেই এ রাজ্যের রাণী ;
কাম ক্রোধ লোভ আদি দুরন্ত প্রজার দলে,
শাসিতে, ত্রাসিতে, আর নাশিতে কঠোর বলে,
নিয়োজিয়া রাখিয়াছি সজাগ প্রহরী 'প্রেমে' !
তাহারি শাসনগুণে প্রজাদল আছে থেমে
শান্ত শিশুদের মত ; আপন গরবে আমি
আপনার রাজগৃহে সুখে আছি দিন-যামী
রাণীটিরে বুকে লয়ে ! পশেনা হেথায় আর.
বাহিরের কোলাহল, উপদ্রব, অত্যাচার ;
উত্থান, পতন. কিম্বা বাহিরের আলো ছায়া,
আকুলতা. অনুতাপ, জগতের মোহ মায়া,
ছুঁইতে পারে না মোরে ! অহরহ শুধু একা,
হৃদয়-রাণীর সাথে হয় গো আমার দেখা !
হাসি খেলা তা'রি সনে, প্রেমালাপ, সম্ভাষণ,
জড়াইয়া রাখিযাছে এই প্রাণ—এই মন।
তবু, মাঝে মাঝে প্রাণে চিন্তা এক জাগে ভাই—
আত্মা যদি রাজরাণী—"আমি" কে ? উত্তর নাই।
আমি কে ?—আমিই "আমি"—আমিই আমার রাণী,
কা'রেও চাহিনা আর—সকলি আমাতে জানি !

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ ঘোষ।

সমালোচনা।

অলৌকিক রহস্য। একখানি মাসিক পত্র। পণ্ডিত শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ সম্পাদিত। আমরা ইহার কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকাখানিতে ভূত-প্রেত সম্বন্ধীয় অনেকানেক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর পক্ষে এ পত্রিকাখানি বেশ সুন্দর হইয়াছে। তবে পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা দেশহিতকর আরও উচ্চ-বিষয়-উপদেশ লাভের আশা করি।

শাস্ত্র-সমন্বয়।

(যতোঽভ্যুদয নিঃ শ্রেযস সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ)

বৈশেষিক-দর্শনে কনাদ-প্রণীত ধর্ম্ম সূত্র।

উক্তসূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, যাহা হইতে অভ্যুদয অর্থাৎ তত্বজ্ঞান হয় এবং যাহা নিশ্রেযস সিদ্ধির হেতু, তাহাই ধর্ম্ম।

সাধারণতঃ ধর্ম্ম দুইভাগে বিভক্ত,—প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম, মহর্ষি কণাদ এস্থানে প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মের ভাব গ্রহণ করেন নাই, কারণ উক্ত প্রকার ধর্ম্মকে পরম্পরায মুক্তির প্রতি প্রযোজক বলা হইয়াছে, নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম ব্যতীত প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম কখনই মুক্তির কারণ হইতে পারেনা, সকামী পুরুষের আচরিত ধর্ম্মই প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম। প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম স্বর্গাদির জনক বলিয়া, বহুস্থানে বহুগ্রন্থে বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে, এবং ইহা সহজেই সকলে উপলব্ধি করিতে সমর্থ, এই বিষয বিস্তার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়॥ আর্য্য ঋষিগণ প্রণীত দর্শন ও অন্যান্য সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য মোক্ষ; শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয, তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির অসাধারণ কারণ॥ সকল মানুষই প্রায মোক্ষের কামনা করিয়া থাকে, এবং তদ্বিষয়ে নানা উপায় অবলম্বন করেন, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি ব্রাহ্ম, সকল জাতীয় লোকের হৃদয়েই ধর্ম্মভাব বিরাজিত রহিয়াছে, সকলেরই উদ্দেশ্য সমান। কিন্তু প্রকৃত মর্ম্ম—তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে (ধর্ম্মস্য-সূক্ষ্মাগতি) কেহ কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারেনা। যে কখনও যে বস্তুর রসাস্বাদন করে নাই, সে সেই পদার্থের রস কিরূপে বুঝিতে সমর্থ হইবে? আর যে মহাত্মা উক্ত রস অনুভব করিতে পারিযাছেন, তিনি অপরকে সেই রস যত্ন করিযাও, আস্বাদন করাইতে পারেন্ না। ইহাতে মহাত্মা রামকৃষ্ণপরমহংস দেবের একদিনের একটী কথা মনে হয। একদা একটী সাধু, উক্ত মহাত্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনারা ধর্ম্ম তত্ত্ব সকল জ্ঞাত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিযাছেন, অতএব আপনাদের মত সিদ্ধপুরুষেরা, যদি ধর্ম্মোপদেশ, এবং ধর্ম্মতত্ত্ব বক্তৃতাদি দ্বারা কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে বহুলোক ধার্ম্মিক হইতে পারে, এবং জাগতিক বহু মঙ্গল সাধন হইতে পারে; সকলেই কিছু কিছু মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হয়। তখন সেই মহাত্মা প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে তুমি কখনও বকুল বৃক্ষের তলায় গমনাগমন করিযাছ কিনা? তখন সে উত্তর করিল অনেক বার। উক্ত বৃক্ষে মধুমক্ষিকার বাসা দেখিয়াছ?—দেখিযাছি; তাহাদের শব্দ শুনিযাছ কিনা? অনেক শুনিয়াছি। আচ্ছা বল দেখি কোন মক্ষিকারা শব্দ করে? তখন সে বলিল—সে কথা কিরূপে বুঝিব। তখন সেই মহাত্মা তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কিরূপ অনুভব—যাহারা মধু পান করে তাহারা কি শব্দ করে? কি যাহারা মধু পায়না তাহারা শব্দ করে? তখন সেই সাধক বলিল সম্ভবতঃ যাহারা মধু পাযনা তাহারাই শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায,—ঠিক বলিয়াছ, যাহারা মধুপান করে তাহারা সমস্তাভাব প্রযুক্ত শব্দ করিতে পারেনা। প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ গুরূপদেশ ও শাস্ত্র, তদনন্তর স্বীয় যত্ন॥

আমাদের আর্য্য ঋষিপ্রবর প্রণীত যে সকল

দর্শনাদি শাস্ত্র, তাহাদের বিভিন্ন মত অবলোকন করিয়া আমরা বড়ই ভ্রমে পতিত হই। সন্দিগ্ধ চিত্তে কখনই কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না, শাস্ত্রের বিভিন্নমতে আমাদের (অনধিকারীর) অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে, অনেকেই উক্তরূপে সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া, ধর্ম্মালোচনা, ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি একপ্রকার ত্যাগ করিয়াই থাকেন, আর্য্য ঋষি প্রবরেরা যে কি ভাবে কোন্ শাস্ত্রে কোন্ মতের অবতারণা করিয়াছেন তাহা আমরা সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, আর উক্ত সন্দেহ থাকে না। যে সময় ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠিরের নিকট বকরূপী ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে (কঃপন্থাঃ) তখন ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন :—

(বেদা বিভিন্নাঃস্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনোযেনগতঃ স পন্থা) উক্ত বাক্য দ্বারা বুঝাযায়, যে কোন ঋষি প্রবরের মতানুসরণ করিলেই আমাদের সকল বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে।

আমাদের প্রায় সকলেরই ধারণা যে, ন্যায়, বৈশেষিক, সাঙ্খ্য, বেদান্ত, পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র সমূহের মতের ঐক্য নাই, কারণ শাস্ত্রমধ্যে যতগুলি পদার্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই সকল পদার্থের বহু বৈলক্ষণ্য আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। যথা ন্যায় বৈশেষিক মতে (আকাশ, দিক্, কাল, মনঃ, পরমাত্মা, প্রভৃতি বহু পদার্থ নিত্য স্বীকার করেন, বেদান্ত কি সাঙ্খ্যমতে উক্ত পদার্থকে "জন্য" অর্থাৎ অনিত্য স্বীকার করিয়াছেন) এরূপ অনেক পদার্থ আছে এক দর্শনে স্বীকার করিয়াছেন, অপরাপর দার্শনিকের মতে তাহা স্বীকার নাই, যথা ন্যায়-বৈশেষিক মতে জাতি, বিশেষ সমবায়, বেদান্ত-সাঙ্খ্য মতে উক্ত পদার্থের কোন সত্ত্বাই নাই। মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বেদান্ত মতে স্বীকার করেন নাই, এইরূপ বহু বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে উদ্দেশ্য সকলের সমান; এবং পরস্পরে বিবাদ শূন্য, বাস্তবিক শাস্ত্র সমূহের সামঞ্জস্য করা যায়॥

নানাবিধ মতভেদ দেখিলে ভ্রমহওয়া অতিশয় সম্ভাবনা, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারাযায়, উক্ত সন্দেহ কোন কাজের নয় কেবল অধিকারী অনধিকারী ভেদে দর্শন শাস্ত্রের ভেদ পরিদৃষ্ট হয়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন, আদি দর্শন। চার্ব্বাকাদি দেহাত্মবাদিগণের দর্শনের অব্যবহিত পরেই, উক্ত দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন হইয়াছে, উহা হইতে দুই তিনটী প্রমাণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। যখন এই বিশাল ভারতভূমি দেহাত্মবাদিগণের দ্বারায় অত্যন্ত নাস্তিকতায় পর্য্যবসিত ছিল, (স্বভাবাজ্জগ জ্জাগতে) স্বভাব হইতে জগদুৎপত্তি হইয়াছে, দেহভিন্ন কোন কিছু বস্তু আছে বলিয়াই, বিশ্বাস ছিল না। তখন আর্য্য ঋষিগণ চার্ব্বাক্ দিগকে নিরাস করিবার জন্য, ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে, প্রথমতঃ চার্ব্বাকাদি দার্শনিকদের মত খণ্ডন পূর্ব্বক, দেহ ভিন্ন কিছু বস্তু আছে— তাহাই বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন একেবারেই যদি অদ্বৈত বাদ অর্থাৎ শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের মত সংস্থাপনের জন্য কেহ প্রয়াস পাইত, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয় বিফল হইত, কারণ দেহ কিছু নয়, বাড়ী ঘর ইত্যাদি যাহা কিছু দৃশ্য বস্তু তৎসমস্তই কিছু নয় একথা বলিলে কেহই সে মত বুঝিত না এবং গ্রহণ করিত না। সেই হেতু সকল বস্তুরই অস্তিত্ব সহকারে দেহেন্দ্রিয়াদ্যতিরিক্ত, কোন একটী বস্তু আছে, অর্থাৎ আত্মাসিদ্ধি করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল॥

কার্য্য মাত্রেরই একটী কর্ত্তা আছে। যেরূপ ঘট একটী কার্য্য তাহার কর্ত্তা কুম্ভকার, সেইরূপ এই বিশাল জগত্ একটী কার্য্য, তাহার একজন কর্ত্তাও আবশ্যক, উক্ত কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব আমাদের কখনও সম্ভব হইতে পারেনা। এই জন্যই অনুমান প্রমাণ দ্বারা একজন অসাধারণ কর্ত্তা সাব্যস্ত হইয়াছে, উক্ত অনুমানের প্রণালী যথা (ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাত্ ঘটাদিবৎ) এই ক্ষিতিএকজন কর্ত্তার জন্য; যে হেতু ইহা কার্য্য; ঘট-কার্য্য দ্বারা যে রূপ কুম্ভকারের কর্ত্তৃত্ব সাব্যস্ত হইয়াছে, সেই রূপ ক্ষিতি কার্য্য দ্বারা পরমাত্মা সাব্যস্ত হইয়াছে, এই পরমাত্মাকেই ন্যায়, বৈশেষিক মতে ঈশ্বর বলিয়াছেন। ইহাতে বেদ প্রমানও আছে

যথা (দ্যাবাভূমি জনয়ন্ দেব এক আস্তে বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা ইত্যাদি) উক্তরূপে ঈশ্বর সিদ্ধি করাই ন্যায়,—বৈশেষিক,—দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। বেদান্তাদিতে যেরূপ, যে মতের অবতারণা হইয়াছে, তাহাতে এরূপভাবে আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, দেহাত্মবাদিগণকে নিরাস করাই কেবল উদ্দেশ্য ছিল। আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করিলে, বেদান্তাদি-দর্শন শ্রেষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি সকল দার্শনিকের উদ্দেশ্য সমান। বেদান্তব্রহ্মসূত্র-প্রণেতা—বেদব্যাস,—ন্যায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গৌতম মুনির শিষ্য সুতরাং শিষ্য, কৃত পুস্তক পূর্ব্বে প্রণয়ন হওয়া কখনও সম্ভব নয়, মহর্ষি গৌতম, বেদান্ত দর্শনের নামোল্লেখ পূর্ব্বক কখনও কোন বিচার করেন নাই বরং বেদান্ত-ব্রহ্মসূত্রে ন্যায়দর্শনের বিচার পাওয়া যায়। এবং গৌতম মুনির অপর নাম অক্ষপাদ, উক্ত নাম হইল কেন,—তাহাতেও ঐ বিষয় অনেক উপলব্ধি করিতে পারা যায়, ব্যাসদেব এক স্থানে ন্যায় মতের অবতারণায় সূত্রে লিখিয়াছেন (শিষ্টাপরিগ্রহাৎ) অর্থাৎ ন্যায়মত — শিষ্টেরা কখনও গ্রহণ করেন না। উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্য মহর্ষি গৌতম অন্যান্য শিষ্যবর্গ মুখে শ্রবণ করিয়া, শিষ্যের প্রতি ক্রোধান্বিত হইলেন, গুরুদেবের অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া, শিষ্যেরাও অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল, তাহাতে মহর্ষির ক্রোধ পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ অভিসম্পাত করিলেন যে, আমি আর তাহার মুখ দর্শন করিব না, সেই সময় ব্যাসদেব উক্ত অভিসম্পাতের বিষয় জ্ঞাত হইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন, কি করিলে গুরুদেব সন্তুষ্ট হইবেন এই চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। একদা অত্যন্ত ভীত চিত্তে গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, বহুবিধ স্তব-স্তুতি করিতে করিতে পদে লুণ্ঠিত হইলেন। তদনন্তর গুরু কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আমি যে কথা বলিয়াছি তাহার অন্যথা হইবে না, তবে এই বর্ত্তমান চক্ষুদ্বারা কখনই তোমার মুখ দর্শন করিব না; আমার চরণ যুগলে দুই অক্ষির উৎপত্তি হইবে, তাহাদ্বারা তোমার মুখ দর্শন করিব। তখন ব্যাসদেব সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীয়—আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন, পদে অক্ষির উৎপত্তি হইল বলিয়া তাঁহার অপর নাম হইয়াছিল অক্ষপাদ, ইত্যাদি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ন্যায়দর্শন বেদান্তাদি দর্শনের পূর্ব্বেই প্রণয়ন হইয়াছে॥

যখন বাল্যাবস্থায় পাঠশালায় গুরুমহাশয় সন্নিধানে, কেবল ক, খ, লিখিতে আরম্ভ করি, একটী চিত্রিত অক্ষরের উপর কলম চালাইতে অভ্যাস করি, তখন যদি ক লিখিতে না শিখিয়া, প্রথমেই খাবাদি সংযুক্ত কালী শব্দের তাৎপর্য্যার্থ জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে গুরু মহাশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মারিতে উদ্যত হন, কারণ তদ্বিষয়ে আমি তখন সম্পূর্ণ অনধিকারী। বর্ণ বোধের পূর্ব্বে কখনই অর্থবোধ সম্ভব হয় না। যেরূপ প্রথমেই উচ্চ শ্রেণীতে পড়িতে পারা যায় না, এক এক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলে, উচ্চ শ্রেণীতে পড়িতে পারা যায়, একটী ছাদে উঠিতে হইলে ক্রমশঃ সোপান অতিক্রম ব্যতীত যেরূপ ছাদে যাওয়া অসম্ভব সেইরূপ যে বিষয়ে যে অনধিকারী তাহাকে সেই বিষয় শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। এই হেতু আর্য্য—ঋষিগণ, একেবারেই অদ্বৈতবাদ না বলিয়া, ক্রমশঃ এক একটী সোপানাতিক্রমনের ন্যায় পূর্ব্বেই ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শনের মতানুযায়ী বলিয়াছেন তদ্বিষয় অধিকারী হইলে অপরাপর দর্শন ক্রমশঃ উক্ত হইয়াছে। তবেই বুঝিতে পারা যায় অনধিকারী ভেদে দর্শনাদি শাস্ত্রের ভেদমাত্র, এইরূপ সমন্বয় ব্যতীত, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আর কিছুই বিশ্বাশ করে না। প্রথমতঃ দেহাত্মবাদ নিরাস পূর্ব্বক ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের উদ্দেশ্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলে তৎপরে শাঙ্খ্য বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীবাই চরণ ভট্টাচার্য্য।

শ্মশানের আত্মকথা।

বিশাল-পরিসরা ধরণী খানির অত্যল্প একটু স্থান জুড়িয়া পড়িয়া আছি—আমি একটা শ্মশান। কোথায়—কেন জন্মিয়াছিলাম—কে আমাকে শ্মশান আখ্যা দিয়াছিল, তাহা কিছুই জানি না—শুধু এইমাত্র জানি যে আমি শ্মশান। যেদিন আমার প্রথম জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, চাহিয়া দেখিলাম,—নির্জ্জননিরালায় আমি একা পড়িয়া আছি, আর পাগলের মত উদাস বাতাস বিষাদ-নিরাশার গান গাহিতে গাহিতে চিতাভস্ম কুড়াইয়া আমার গায়ে ছড়াইয়া দিতেছে। কি সে দিন।—মনে হইলে আজও যেন আমি কেমন হইয়া যাই!

সেইদিন আমি সভয়ে, সকাতরে চারিদিকে চাহিয়া খুঁজিয়াছিলাম—আমার দুঃখে দুঃখী হইতে, আমার ভয়কাতর প্রাণকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতে কেহ আছে কি না? কাহাকেও পাইলাম না। বড় আশায় সম্মুখে চাহিয়া সত্রাসে দেখিলাম—সেদিকে উন্নতশীর্ষ তরুরাজির তল-দেশে কণ্টকস্তূপকে জড়াইয়া ধরিয়া, লতাগুলিকে পদতলে চাপিয়া রাখিয়া, বিরাট বিপুল অন্ধকার যেন তীক্ষ্ণ কটাক্ষে আমার দিকে চাহিতেছে। উভয় পার্শ্বে চাহিলাম কিন্তু অনন্ত বিস্তৃত-উলঙ্গ বালুকাক্ষেত্রের পৈশাচিক হাসি ছাড়া আর কিছুই পাইলাম না। শেষে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পশ্চাতে ফিরিলাম। সেদিকে কি দেখিলাম,—ভয়-দুঃখ ভুলিয়া কৃতজ্ঞনয়নে দেখিলাম,—আমারই তৎকালীন অবস্থায় যেন করুণার্দ্র হইয়া, স্নেহাশ্রুপূর্ণা একটী শীর্ণকায়া তটিনী-তর্ তর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছেন, আশ্বস্ত-প্রাণে আমি তাঁহার দিকে সম্মুখ ফিরিয়া বসিলাম।

সেইদিন হইতে আমি তটিনীপানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম; তাঁহার নীরব স্নেহ আমার বড় ভাল লাগিত। তাঁহার হৃদয়-সমুত্থিত করুণা-লহরী-লীলা আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; যখন মানবদল চিতাগ্নি দিয়া আমার হৃদয় পুড়াইয়া দিত, তিনি স্নেহ-সলিল-সিঞ্চনে আমার তপ্তবক্ষ জুড়াইয়া দিতেন, যখন উন্মাদ বায়ু আমার গায়-চিতাভস্ম ছড়াইত, তিনি ঊর্ম্মি-অঞ্চলে আমার গায়ের ধুলা মুছাইয়া দিতেন। যখন ভীষণ অন্ধকার আমাকে ভয় দেখাইতে আসিত, তিনি আপন হৃদয়ে তারকা-খচিত অম্বর-প্রতিবিম্ব ধরিয়া আমার নয়ন-সমক্ষে আলোক-পথের সৃষ্টি করিতেন। তাঁহারই হৃদয় দেখিয়া আমি স্নেহকরুণা চিনিয়াছিলাম—তাঁহার হৃদয়ালোক দেখিয়াই ঊর্দ্ধদৃষ্টে আকাশ-পথে চাহিতে শিখিয়াছিলাম। হায়, সেদিন আর নাই।—জননীর মত স্নেহে, এ দগ্ধ শ্মশানকে বুকে ধরিয়া তিনিও আর নাই। অধিকদিনের কথা নহে, তপ্ত-সৌরকরে শীর্ণা হইতে হইতে, সে তটিনী—সে দেবী, কোথায়, কোন দূরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র আসন আজ লতাগুল্মে আচ্ছন্ন, শ্বাপদ-সঙ্কুল বিস্তীর্ণ কণ্টক ক্ষেত্র। কেন এমন হইল? কে বলিবে কেন হইল। কে বলিবে,—স্নেহভরা হৃদয়ও শুষ্ক হয় কেন?

আমি শ্মশান,—তথাপি আমার বুকে যে সংসার-ভার জড়িত ছিল, বিষাদ-প্রীতির যে ক্ষীণ সঞ্চরণ অনুভূত হইত, তাহা আর নাই; আজ আমি প্রকৃতই মহাশ্মশান! যে সকল লোকে শ্মশানকে পবিত্র, শান্তিময় ও স্বর্গের ছায়া বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারা বুঝি আমাকে দেখে নাই? তাহারা বুঝি জানেনা, এ শ্মশানে যে আসে সে পুড়িতেই আসে—এ-শ্মশানে যাহারা পোড়াইতে আসে তাহারাও পুড়িয়া যায়! বিশ্বাস না হয়, যাহারা আত্মীয়ের শব এ শ্মশানে পোড়াইয়া গিয়াছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিও আজও তাহারা পুড়িতেছে কিনা?—তাহাদের জিজ্ঞাসা করিও, আমার উত্তাপ কত দাহনশীল?

প্রতিনিয়ত চিতানলে আমার হৃদয় এত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে যে আর দূর্ব্বাটী পর্য্যন্ত এখানে

জন্মিতে পারে না; কিন্তু এত অত্যাচারেও আমার প্রাণে শান্তি আছে। যদিও আমার স্পর্শে জীবমাত্রেই পুড়িয়া মরে তথাপি আমার নিজের প্রাণে শান্তি আছে। শুনিবে সে শান্তি কি?—প্রাণভরা বিষাদ, উদাস নিরাশা, স্মৃতির ছাইভস্ম, আর জমাট অন্ধকার! তোমরা হয়ত হাসিবে, হয়ত বুঝিবে না—ইহাতে শান্তি কি—কিন্তু আমার বিশ্বাস, এইগুলিই শান্তির একমাত্র উপাদান। কেন এরূপ বিশ্বাস হইল শুনিবে? তোমাদের হয়ত মনে আছে যেদিন আমি প্রথম চক্ষু চাহিয়া দেখি, সেদিন শুধু নিরাশা আর বিষাদই অনুভব করি—শুধু অন্ধকারের ভ্রূকুটি এবং সর্ব্বাঙ্গে ভস্মপ্রলেপই দেখি, পরক্ষণেই তটিনীর অমল স্নেহ এ হৃদয় পূর্ণ করায়, আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, যেখানে দুঃখ নিরাশা সেইখানেই স্নেহ করুণা আছে। সেইদিন হইতে দুঃখ ও স্নেহ-জনিত তৃপ্তির সম্বন্ধ আমার অন্তরের সহিত এরূপ জড়িত হইয়া গিয়াছে যে আমি একটীকে অপরটী হইতে পৃথক করিতে পারি না। আজও তাই বিষাদে নৈরাশ্য, ভস্মস্তূপে আর অন্ধকারেই বেশ পূর্ণ শান্তি উপভোগ করিতেছি।

প্রাণী জগতের শান্তির সংজ্ঞা বুঝি অন্যরূপ, তাই জগত-স্রোত আমা হইতে দূরে দূরে বহে—তাই জগত হইতে বিতাড়িত প্রাণহীন শব ভিন্ন কোন জীবিত প্রাণী আমার নিকট আসিতে চাহে না—তাই এই শ্মশানের শ্মশান-হৃদয়ের সহিত সংসারের অনুভূতি মেলে না। তা না মিলিলেও আমি কোন অভাব বোধ করি না——কারণ, যদিও তটিনী আর নাই, তথাপি তাঁহার স্মৃতি আমার প্রাণ উজ্জ্বল করিয়া আছে তথাপি তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন আমার নয়ন সমক্ষে অহরহ ভাসিতেছে। সে চিহ্ন কি?—সশুভ্র শুভ্র-কুসুম-পরিশোভিতা একটী মল্লিকা-লতিকা। জানি না কোন্ নন্দনকানন ধৌত করিয়া তটিনী ইহার বীজ আনয়ন করিয়াছিলেন,—জানিনা কোন্ স্বর্গের স্নেহ-বারি-কণা-সিঞ্চনে তিনি এই কোমল লতাটীরে বর্দ্ধিতা করিয়াছিলেন—জানিনা, কি শুভক্ষণে তিনি তাঁহার চিরবিদায়-স্মৃতির চিহ্নস্বরূপ এটী আমার দগ্ধ হৃদয় পার্শ্বে রোপিত করিয়া গিয়াছেন।

আজ এই লতাটীর শুভ্র স্নেহ-কুসুম-সৌগন্ধে শ্মশান যে আমি—আমিও আত্মহারা হই। যখন দগ্ধ শবের দুর্গন্ধ আমার নাসিকারন্ধ্র আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন সে ভগ্নীর ন্যায় স্নেহে আমার প্রাণময় তাহার বিমল কুসুম-সৌরভ ছড়াইতে থাকে, যখন আমি অনল তাপে জ্বলিতে থাকি, সে নীরবে নীহারছলে আমার বক্ষপার্শ্বে অশ্রু-বর্ষণ করে। হায় এ স্নেহ কত গভীর তাহা বুঝিয়াও আমি প্রতিদান দিতে পারি না—শুধু তাহাকে শুষ্কই করি। ওগো, আমি যে শ্মশান।

যদিও আমি স্নেহের প্রতিদানে তাহাকে শুষ্ক করিতে বাধ্য হই, তথাপি সে আমার প্রতি মায়া মমতাময়ী, কারণ সে বুঝিতে পারে, আমার হৃদয়ে যাহা আছে তাহা শুধু অনুতাপ ও অগ্নি। তথাপি সে আমার প্রতি স্নেহ পরায়ণা কারণ আমার যাহা নিজস্ব সম্পত্তি তাহাই আমি তাহাকে দিয়া থাকি। হায় হায় জগদীশ। কেন আমাকে শ্মশান করিয়া গড়িয়াছিলে? বুঝিলেও আমি যে বুঝিনা, যে আমার এই দাহন-স্বভাবই তাহার স্নেহের অকপট প্রতিদান আমাকে জুড়াইতে আমাকে শান্তি দিতে যখন সে তাহার সমগ্র শক্তি-নিয়োগের বিনিময়ে আমার অন্তর-তাপে দগ্ধ হয়, তখন আমি নীলাম্বর-প্রক্ষিপ্ত-দৃষ্টে ভাবি—"করুণাময়ি তটিনি! তুমি আজ কোথায়?" তখনই তাঁহার সেই হৃদয়ের তারকা-প্রতিবিম্ব ঠিক তেমনি ভাবে আকাশগাত্রে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত দেখি, আর বিস্ময় পুলকিত প্রাণে আপনা আপনিই উত্তর দিই—"স্বর্গে।" এই এখন আমার জীবনের একমাত্র শান্তি।

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ ঘোষ

—○—

এত অভিমান ?

(১)

কিলযে চলেছ বালা
একেলা সাযঙ্ক বেলা
কোথা তোব কোমলতা
সোহাগ আদব,

সুখ-স্মৃতি এ ধবাব
এতই কি তুচ্ছ ছাব ?
একটু বুঝিনা তাব
কেমন অন্তব।

(২)

কোথাও দেখিনা কাব
এতরূপ এ ধবাব
নয়ন বদন চাক
স্বর্গীয অধব,

যেমন কোমলস্বর
ব্যবহাব প্রীতিকব
তেমতি হৃদয তাব
সবল সুন্দর।

(৩)

শত দুঃখ শত জ্বালা
তুমিই গোপনে বালা
নীববে সযেছ বুকে
চাপিযা পাথব,

কে জানে কি ভেবে আজ
হৃদয়ে হানিছ বাজ
সদলে চলেছ তাই
নির্ভয অন্তব।

(৪)

যাতনার অশ্রুধার
কোথায কে বুঝে কাব
কেবল বুঝেসে বড
ব্যথিত কাতব ;

সবলে। তাই কি হেলে
জীবন দিযেছ ঢেলে
পলকে আপন যত
হয়ে গেল পব।

(৫)

পিতা মাতা ভাই বোন্
যদিও বা হয খুন
অভিমানে ভেঙ্গে যায
সবল আদর ;

কে জানে কি ভেবে আজ
একটু সংলনা বাজ
একটু হলনা স্নেহ
একটু কাতব।

(৬)

প্রাণপন অভিমান
ধন্য বমণীব মান।
পলকে ঘটায়ে দেয
নব যুগান্তর ;

বুঝিতে আমাবি ভুল
ও যে স্ববগেব ফুল
স্বর্গেব মন্দার রবে
ধবার উপর ?

শ্রীগোপীনাথ বর্ম্মণ সিংহ।

হিন্দু-মহিলা।

অমানিশার ঘোর অন্ধকারে অবনীমণ্ডল পরিব্যাপ্ত—রজনী তৃতীয় প্রহরে পদার্পণকরিতেছে। জীবজন্তু নিস্তব্ধতার ক্রোড়ে শায়িত। আকাশে দুই একটী নক্ষত্র উক্ত নিস্তব্ধতার সুযোগ পাইয়া অসদভিলাষে ক্ষুদ্রপ্রাণে মিটি মিটি হাসিতেছে, আর কোনটী বা প্রকৃতির বিভীষিকা-মূর্ত্তি দর্শনে ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া মেঘান্তরালে লুকাইতেছে। প্রণবও আজ তন্দ্রাভিভূত। এমন সময় অদূরে ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠোত্থিত করুন চীৎকার কাহার? "ত্রাহি"-"ত্রাহি" রবে এমন সময়ে প্রণবের তন্দ্রা ভাঙ্গিতেছে কে?

স্বরের কোমলতাশ্রবণে বোধ হইতেছে যেন উহা বামাকণ্ঠ। তবে সত্যই কি উহা রমণীর করুণ চীৎকার? না, না, এতগম্ভীর নিশায় বামাজাতি একাকিনী বাহির হইবে কেন? তবে কি সে কোন প্রিয়জন বিরহে শোকোন্মাদিনী হইয়া তাহারই সন্ধানে ছুটিয়াছে? না, না। তবে "ত্রাহি"-"ত্রাহি রব কেন? উহা নিশ্চয়ই কোন ডাকিনীর খেলা।

একি? অই যে আলুলায়িত কেশে উন্মাদিনী এদিকে পলাইয়া আসিতেছে—একে? কে তুমি? বেশভূষা সন্দর্শনে বোধ হইতেছে, যেন তুমি কোন হিন্দু মহিলা। সত্যই কি তুমি হিন্দু মহিলা? মা, আজ তোর এই বেশ কেন? তুই আজ উলঙ্গিনী কেন? কে তোর বস্ত্রাপহরণ করিল?—যবন? আজ যবনের অত্যাচারে তুই সতীত্বরক্ষার জন্য ছুটিয়া পলাইতেছিস্?

উঃ! কি ভীষণ কথা! ইহার কথা মনে হইলেও যেন হৃদি-বেথীকার গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে। দয়াময়, আজ তুমি কোথায়? কোন অন্তরালে বসিয়া আজ হিন্দু-রমনীর এই দুর্দ্দশা দেখিতেছ? তুমিত অবলার অপমান সহ্য করিতে পার না। তুমিত একদিন অসংখ্য জন মণ্ডলীর সম্মুখে নারী-কুল-প্রভা সতী দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণে অগ্রসর হইয়াছিল? আজ তাঁহারই কুলনারীর লজ্জা নিবারণে পশ্চাৎপদ কেন?

জীবকুল ভূষণা যে সাবিত্রী একদিন সতীত্ব-বলে জীবকুল-নিসূদন যমরাজের নিকটও পতির প্রাণভিক্ষা করিতে তিলেকমাত্র ভয় করেন নাই, আজ তাঁহারই কুলকামিনীগণ সেই সাবিত্রী-প্রদর্শিত পবিত্রধন সতীত্ব রক্ষার জন্য আলুলায়িত কেশে, উলঙ্গিনী বেশে প্রধাবিতা!

মা, পলাইওনা, উন্মাদিনী বেশ ত্যাগ কর। দৃঢ়ভাব অবলম্বন কর। যেই দয়াল ঠাকুর তোমাদেরই কুলপ্রভা সতী দ্রৌপদীর সতীত্ব রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, তিনিত সর্ব্বজ্ঞ। উচ্চ-শৃঙ্গ-ভূধর-শৃঙ্গ হইতে অতল জলধির তলদেশ পর্য্যন্ত সকল বস্তুই তাঁহার দৃষ্টির অন্তর্ভূত। তিনিই তোমাদের অপমান ঘুচাইবার জন্য হাত বাড়াইবেন। কারণ তিনি নিজেই বলেন 'যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ." তবে মা তোমাদের বিপদ কোথায় তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শকরে এমন সাধ্য কার?

মা, এখনও তোমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই। যেই সতীত্বের জন্য আজ হিন্দু জাতি সদর্পে সগৌরবে অন্যান্য জাতির নিকট উন্নতবদনে দাড়াইতে পারে, মা! তোমাদের সে সতীত্বত এখনও অক্ষুন্ন ভাবে বর্ত্তমান।

মা, তোমরা হিন্দু মহিলা, তোমাদের মত সতী আর কোন্ জাতিতে মিলে? হিন্দু-মহিলাকে কোন জাতি না সতীত্বের আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করে? তোমাদের সতীত্বের সাক্ষী অগ্নি, তোমাদের সতীত্বের সাক্ষী ধর্ম্মরাজ স্বয়ং; আর তোমাদের সতীত্বের জ্বলন্ত সাক্ষ্য রূপে সমগ্র জগত দণ্ডায়মান। ইহার কারণ কি মা? তোমরা কেন সতীদিগের আদর্শস্থান অধিকার করিলে? ইহার উত্তরে সকলে একবাক্যে স্বীকার করিবে যে ভারতে স্ত্রী স্বাধীনতার প্রতি বিদ্বেষই ইহার মূলে সংস্থাপিত।

আমরা সগর্ব্বে বলিতে পারি হিন্দু মহিলারা অসূর্য্যম্পশ্যা। তাহারা প্রেমের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুড়িয়া বেড়ায় না, তাঁহাদের কুমারী স্বামীর অনুসন্ধানে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া যায় না। হিন্দু মহিলা স্বেচ্ছাচারিণী নহে। তাহারা ইচ্ছামত দেশবিদেশ পরিভ্রমণ করিতে পারে না, স্বামীই তাহাদের একমাত্র দেবতা, স্বামীই তাহাদের ধন, স্বামীই তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম এবং হৃদয়সর্ব্বস্ব। সতীত্বই তাহাদের ইহ-জগতে একমাত্র ধন। উহা অত্যাচারীর উৎ-পীড়নে, অনশনের ভীষণ পেষণে, অসহ্যযন্ত্রণা সহনেও টলিবার নয়।

উহার উদাহরণের অভাব নাই। দশমবর্ষীয় বালকবালিকা হইতে অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ বৃদ্ধারও অন্তরে ইহার জলন্ত উদাহরণ জলন্ত অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। কালের গতি উহার উপর কালিমা নিক্ষেপে এখনও সমর্থ হয় নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বের ঘটনাবলীর উপর একবার দৃক্-পাৎ করুণ—দেখিবেন বঙ্গের অনেক স্থানে রমণী গণ দুরন্ত যবনের অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, আপন অমূল্য সতীত্ব ধন রক্ষার নিমিত্ত, নিজ বক্ষে অথবা অত্যাচারীর বক্ষে তীক্ষ্ম ছুরিকা প্রবেশ করাইয়া সকল জ্বালা নির্ব্বাপিত করিয়াছে। ঐরূপ স্থলে শাণিত কৃপাণ, ভয়ঙ্কর হলাহলই বঙ্গ রমণীগণের একমাত্র উপায়। আমরা তাহাদের কুপুত্র। তাঁহাদের অত্যাচার নিবারণের জন্য জগদীশ আমাদের হাতে শক্তি দেন নাই বটে, কিন্তু তাহাদের আত্মরক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগকেত সুন্দর প্রশস্ত পথ দেখাইয়া দিয়া উপাদান গুলি যথা স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন।

যে রমণীগণ সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হন না, তাঁহাদের ন্যায় রমণী আর কোন্ জাতিতে মিলে? তাঁহা-দের নির্ম্মল স্বভাব কি দেব-দুর্ল্লভ নয়? দিগাঙ্গ নাগণ কি উত্তর তোরণে পুষ্প-মাল্য করে তাঁহা-দের অভ্যর্থনার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান নহে?

সতীত্ব রক্ষার জন্য জলন্ত বহ্নিকুণ্ডে ঝম্প-প্রদান করিয়া অক্ষুণ্ণভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে—এমন সতী কোন্ জাতিতে মেলে? ঐ আমাদের সীতাদেবী এবং খুল্লনা প্রভৃতি সতী ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্যরূপে এখনও জগতের কীর্ত্তি-কক্ষে দণ্ডায়মানা।

সতীত্ববলে মৃত স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারে এমন সতী জগতে কয় জন মিলে। ঐ আমাদের সতীলক্ষ্মী "সাবিত্রী" ঐ আমাদের সতীকুলভূষণা "বেহুলা" সুন্দরী শাস্ত্রবক্ষে দাঁড়া-ইয়া উহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছেন।

"প্রবলা স্বামীভক্তিবলে জীবন্তে অক্লেশে মৃত স্বামীর সহিত শ্মশানের শেষ শয্যায় শায়িত হইতে পারে কে?"

ইহা শুনিবামাত্র সকল জাতীয় মহিলাবর্গই ভীতিবিহ্বল—বিস্ময়-নেত্রে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া আকাশধ্যানে মগ্ন হইবেন। কেবল নির্ভীক-হৃদয়া হিন্দুমহিলাই প্রীতি-প্রফুল্লনেত্রে সতীত্ব-সাহসে ভর করিয়া সদর্পে সম্মুখীন হইয়া বলিবে "আমি পারি।"

ইহার সাক্ষীর জন্য আর শাস্ত্রাদি অন্বেষণ করিতে হইবে না। একজন অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি চক্ষের উপরই শত সহস্র দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিয়া মনের ভ্রান্তি দূর করিয়া দিবেন। উঃ স্বামীচরণে কি প্রবলা ভক্তি। স্বামী-প্রেমের কত প্রবলা শক্তি, সতী-ত্বের কত মহতী ক্ষমতা!—যেই চিত্রভানুর বিচিত্র চিত্র দর্শনে পর্য্যন্ত ভয়ে অঙ্গ লোমাঞ্চিত হয়, পতিচরণে অসীম ভক্তি-প্রভাবে, স্বামীর প্রতি একাগ্রতা-প্রভাবে জীবন্তে সেই চিত্রভানুর বিচিত্র অঙ্কে শয়ন করিতে হিন্দু-মহিলা বিন্দু-মাত্র বিচলিত হন না। বসুমতী যেরূপ স্বীয় কন্যার যন্ত্রণাদর্শনে আপন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সেই ছিন্ন বক্ষে সতী ললনার স্থান দিয়াছিলেন, সেইরূপ বীতিহোত্রও স্বীয় পৌত্রীর সতীত্ব প্রদ-র্শনে জগতকে সতীত্ব শিক্ষা দিবার জন্য সবক্ষে শীতলতা প্রদান করিয়া সতী পৌত্রীর জন্য দুগ্ধ-ফেননিভ সুকোমল শয্যা করিয়া দেন; এবং হিন্দুমহিলাই ঐ শয্যার একমাত্র অধিকারিণী।

হে প্রেমোন্মাদিনী সতীলক্ষ্মী বীরবালে! হে পতিসোহাগিনী পালঙ্কশায়িনী পিতামহি!

আজ তোমাকে আমার সহস্র প্রণাম ; তোমার কাহিনী মনে পড়িয়া আজ মন পবিত্র হ'ল। দেবি ! তুমি সারাদিন গৃহ-কর্ম্ম-সম্পাদনে ক্লান্ত হইয়া যেরূপ দিবাবসানে বিরামলাভের নিমিত্ত স্বামীর পালঙ্কে আরোহণ করিতে, ঠিক সেই-রূপে কর্ম্মনিরত সংসারের নানা আঘাতে জর্জ্জ-রিত হইয়া দাম্পত্যলীলার অবসান-দিনে সীমন্তে মঙ্গল সিন্দুর পরিয়া শেষ-বিরামের জন্য স্বামীর শ্মশান-পালঙ্কে শয়ন করিয়া জগতে ধন্য হইয়া গিয়াছ। মৃত্যুর কাল-মূর্ত্তি তোমার কাছে ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিয়াছে। বিভীষিকা-ময় বীতিহোত্রের সেই ভীষণ গর্জ্জন তোমার কর্ণে মঙ্গল বাজনা রূপেই বাজিয়াছে। আর বৈশ্বানরের বিশ্বদাহী অঙ্ক তোমার কাছে বিশ্ব-জননীর সুশীতল অঙ্করূপেই অনুভূত হইয়াছে। হে স্বর্গনিবাসিনী সতিলক্ষ্মি ! আজ তোমার পবিত্র অঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নি উজ্জলতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে ; অগ্নি আজ বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তোমারই সতীত্বকাহিনী বহন করিতেছে।

যিনি একবার বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণ-কান্তের উইল পড়িয়াছেন, তিনিই বর্ত্তমানের হিন্দু মহিলার প্রকৃত প্রকৃতি বুঝিয়াছেন। সূর্য্য-মুখী ও ভ্রমর উভয়েরই পতিভক্তি অচলা, উভ-য়েরই স্বামী ধন, স্বামী সুখ, স্বামী ঐশ্বর্য্য, স্বামীই সর্ব্বস্ব। নগেন্দ্রনাথ যখন কুন্দনন্দিনীতে আসক্ত হইলেন, সূর্য্যমুখী ইহা জানিতে পারিয়াও কুন্দা-ভাবে নগেন্দ্রনাথের জীবন বিষময় হইবে ভাবিয়া স্বীয় স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া নগেন্দ্রনাথের উপর অভিমান করার পরিবর্ত্তে বরং কুন্দকে তাঁহার সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। এইরূপ স্বার্থবলি কোন জাতীয় মহিলা কোন দিন দিতে পারিয়াছে ? অন্য দেশে স্ত্রী স্বামীর জন্য অনেক সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারেন বটে, কিন্তু এইরূপ সপত্নী-হিংসা ভুলিয়া কোন দেশীয় মহিলা কোন দিন দৃষ্টান্তস্থলে দাঁড়াইয়াছেন ? এইরূপ প্রেমের আত্ম-বিসর্জ্জন কোন দেশীয় মহিলাতে সম্ভবে ?

আর গোবিন্দলাল রোহিণীতে আসক্ত হইয়াছে দেখিয়া ভ্রমরের রাগ হইল বটে, কিন্তু যে রাগ ভক্তিমাখা, যখন গোবিন্দলাল শেষ বিদা-য়ের নিমিত্ত ভ্রমরের নিকট আসিলেন, তখন ভ্রমর বলিলেন, "যাও কিন্তু মনে রাখিও উপরে দেবতা আছেন, আজ তুমি আমাকে কাঁদাইয়া চলিলে কিন্তু একদিন তোমাকেও আমার জন্য কাঁদিতে হইবে, মনে রাখিও একদিন তুমি খুঁজিবে এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম স্নেহ কোথায় ? দেবতা সাক্ষী, যদি আমি সতী হই, যদি কায়-মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে তবে তোমায়-আমায় আবার দেখা হইবে। মনে রাখিও আবার আসিবে, আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে, আবাব আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও, দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী, তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই, তুমি আমারই—রোহিণীর নও।" দেখুন ভ্রমরের স্বামীভক্তি কত প্রবলা। ভ্রমবের ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরে বিশ্বাস, সতীত্বে বিশ্বাস কত প্রবল। সতীত্বের এমনি ক্ষমতা যে ভ্রমরের কথাগুলি বর্ণে বর্ণে ফলিল, প্রকৃতই গোবিন্দলালকে কাঁদিতে হইল। প্রেমের এই-রূপ নিগূঢ় বন্ধন কোন জাতীয় মহিলা দেখা-ইতে সমর্থ হইয়াছেন ?

আরও দেখুন, দুরন্ত রাবণের তৃষানলে পড়ি-য়াও যে সীতা অক্ষুণ্ণভাবে সতীত্ব রক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ; রামচন্দ্র অবিশ্বাস করিয়াই হউক, বা প্রজাবৃন্দের মনস্তুষ্টির নিমিত্তই হউক সেই সীতাকে জলন্ত বহ্নি রূপে নিক্ষেপ করিয়াও তাঁহাব সতীত্ব পরীক্ষা করি-লেন, কিন্তু তাহাতেও হইল না, তাহাতেও বোধ হয় রামের মনে দ্বিধাভাব রহিয়া গেল। অবশেষে বিনাদোষে শুধু সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া রাম-চন্দ্র সীতাকে নির্ব্বাসিত করিলেন। রাজনন্দিনী রাজরাণী বনবাসিনী ভিখারিণী সাজিলেন, সুবর্ণাভ পট্ট বসনখানির পরিবর্ত্তে গৈরিক-বসন ধারণ করিলেন। রাজভোগের পরিবর্ত্তে সামান্য নীবারান্নের উপরই নির্ভর করিতে লাগিলেন, দুগ্ধফেন-নিভ মহার্হ রাজশয্যার পরিবর্ত্তে পর্ণা-বৃত ভূমিকেই শয্যারূপে আলিঙ্গন করিলেন।

হর্ম্ম্যভূষিত রাজপ্রাসাদের পরিবর্ত্তে, অরণ্য প্রান্তস্থিত পর্ণকুটীরেই আশ্রয় লইলেন, এইরূপে আরও কত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিলেন, কিন্তু তবুও বিনাদোষে নির্ব্বাসন-দণ্ডদাতা ভর্ত্তার প্রতি তিলেক মাত্র নিন্দাপ্রয়োগ করিলেন না, তবুও অভাগিণী আপন দুঃখভাগী আত্মকেই পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিতে লাগিলেন। এইরূপ সতী জগতে কয়জনা মিলে? পতিচরণে এইরূপ অচলা ভক্তি কোন জাতীয় মহিলাই বা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন?

এইতগেল' সতীত্ব, পতিভক্তি, প্রেমের-আত্মবিসর্জ্জন প্রভৃতির কথা, ভাবতে এমনও একদিন ছিল, যখন আর্য্যরমণীগণ বীরত্ববীণার ঝঙ্কারে সমগ্র ভূমণ্ডল মাতাইয়া তুলিয়াছিল, এমনও একদিন ছিল, যখন আর্য্যরমণীগণ বীরবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে আপন বীরপণা দেখাইয়া সমগ্র বিশ্বমণ্ডলকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছিল।

হেমচন্দ্র গাইয়াছেনঃ—

"এই বঙ্গভূমে করেছিল লীলা,
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী, সুশীলা,
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা
সাবিত্রী ভারত পবিত্র ক'রে!
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ছুটিত সমরে
খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়ে
ধনুদণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া,
সমর উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে"।

আমরা আজ গর্ব্ব সহকারে বলিতে শিখিয়াছি, "প্রতাপের দেশ এই পদ্মিনীর ভূমি" এই প্রতাপ-পদ্মিনীর নামটুকু কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিবা মাত্র কাহার না হৃদয় গর্ব্বে ফুলিয়া উঠে? কোন ভারতবাসী আজ নীরবে দুফোঁটা অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারে? উঃ! হৃদয়ের কত শক্তি! এমন বীরত্ব আর কোন্ জাতীয় মহিলা কোনদিন দেখাইয়া গিয়াছে। ধন্য পদ্মিনি! ধন্য তোমার বীরপণায়, ধন্য তোমার সতীত্বে! তুমি আজ আর্য্যজাতিকে সুমেরু শৃঙ্গে বসাইয়াছ।

বঙ্গীয় রাণী লক্ষ্মী বাইএর নাম স্মরণে কাহার হৃদয় না বীরমদে মাতিয়া উঠে! তাঁহার বীরপণার কথা স্মরণে কাহার হৃদয় বিস্ময় রসে আপ্লুত না হয়? স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এমন বীরপণা দেখাইতে কোন জাতীয় মহিলা পারিয়াছে? অসংখ্য আর্য্যরমণীই এইরূপ কীর্ত্তিকক্ষে দণ্ডায়মান। আর্য্যরমণীগণ বীরত্বে সকল জাতীর রমণীশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধহয়।

আমাদের হিন্দুমহিলা সর্ব্বগুণ বিভূষিতা কুলকামিনী। স্বীয় স্বার্থ বলিদানে অত দ্রুত-পদবিক্ষেপে অগ্রসর হয়, এমন মহিলা অপর কোন জাতিতে মিলে কিনা সন্দেহ। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে উপবিষ্টা রমণীর কথা শুনিলে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই বিস্ময় রসে ডুবিয়া নিস্পন্দ হইয়া থাকিবেন।

যে কবালগ্রাসী দুর্ভিক্ষ বর্ত্তমানে বঙ্গের ঘরে ঘরে আপন মনে ঘূর্ণায়মান, প্রথম বিকাশকালে তাহার আকৃতি কত ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বোধ হয় সকলের এখনও স্মরণ আছে। পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থানে অন্নাভাবে উন্মাদগ্রস্থ হইয়া পিতা পুত্রকে, স্বামী স্ত্রী, কন্যাকে হত্যা করিয়া অবশেষে আপন গলে ছুরিকা প্রবেশ করাইয়া সকল জ্বালা নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন উহাও বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। বিভীষিকাময় দুর্ভিক্ষানল তখন দ্বিগুণ বেগে, চতুর্গুণ তেজে প্রজ্জ্বলিত। কাজেই আমাদের মহামহিম দয়ার সাগর, গবর্ণমেণ্টও তখন প্রতিকার পরাঙ্মুখ; সুতরাং রাজকর্ম্মচারীগণ হইতে নিয়মানুযায়ী কোন সাহায্য প্রার্থনা করাও অরণ্যে রোদনমাত্র, এই ভয়ঙ্কর দশা দর্শনে বঙ্গবাসীমাত্রেরই অন্তর-সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। পঞ্চমবর্ষীয় বালক হইতে অশীতি পর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই স্বীয় সহোদর সহোদরার জীবন রক্ষার্থে ব্যগ্র হইয়া দেশে দেশে, নগরে নগরে, দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

পতিপুত্রহীনা বঙ্গমহিলাগণ আজ স্বীয় সহোদর সহোদরার, জনকজননীর অবস্থা সন্দর্শনে স্বীয় পিঞ্জরে মলিন বদনে উপবিষ্টা। আজ সিন্দুর

বিন্দুও প্রফুল্লতাদানে অক্ষম। দেশের মহামনা নেতৃবৃন্দ কোথায়ও বা মুষ্টিভিক্ষা প্রথানুসারে কোথায়ওবা সভাসমিতিতে উপস্থিত জনমণ্ডলী হইতে কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণে, এইরূপ নানা উপায়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একদিন পূর্ব্ববঙ্গের সুবিখ্যাত বরিশাল সহরে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে সমাগত জনমণ্ডলী হইতে সাহায্য গ্রহণার্থ এক বিরাট সমিতির আয়োজন হয়। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেই উক্ত সমিতির বিষয় জ্ঞাত হইলেন। সকলেই স্বীয় সাধ্যানুক্রমে কিছু কিছু দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনমণ্ডলীর সাহায্যার্থে দান করিবার নিমিত্ত স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া রহিলেন, কেবল দেশের একপ্রান্তস্থিত এক পর্ণকুটীর নিবাসিনী এক হিন্দু রমণীই আজ চিন্তাসাগরে নিমগ্না। তাঁহার স্বামী আজ প্রবাসে অর্থ সন্ধানে ঘূর্ণায়মান। তাঁহারই উপার্জ্জিত ধনে কোনও মতে আজ পর্য্যন্ত উদরান্নের সংস্থান হইতেছে। গৃহে এক পঞ্চম বর্ষীয় বালক সমবিভ্যাহারে সেই দুঃখিনী, হিন্দুমহিলা সরোজিনী। আজ তাঁহার অন্তরসমুদ্র সংক্ষুব্ধ. আজ গায়ক তাঁহার জন্য আনন্দ তান ধরে না। আজ অংশুমালী তাঁহার নিকট অংশুশূন্য ; সুধাংশু ও সুধাংশুশূন্য। স্বীয় পুত্রের কোমল বদন খানিও আজ তাহার অন্তরে শান্তানিল প্রবহনে অক্ষম। তাঁহার অন্তর আজ শুধু এই চিন্তাতেই পরিপূরিত "আহা। আজ সকলে দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট জনমণ্ডলীর জন্য কিছু কিছু দিতেছে, আর আমি—আমি অভাগিনী একমুষ্টি চাউল পর্য্যন্ত দিতে অক্ষম।

আজ কতজন দুই তিন দিনের অনাহারে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত, আর আমি প্রতি বেলায় উদরপূর্ত্তি করিয়াও তাহাদের জন্য একমুষ্টি চাউল দিতে নারাজ। ছি, ছি, আমার মত পাষাণী আর এই ভবার্ণবে কয়জনা আছে ?

যাক্, সব সুখ রসাতলে যাক্।—আমি আমারই একমাত্র সম্বল এই সুবর্ণ কঙ্কণ দিয়া যদি দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট একজনার দুঃখ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও দূর করিতে পারি চেষ্টা করিব।

স্বামী আমার উপর রাগ করেন, পায়ে ধরিয়া বুঝাইব,উপবাসে কাল কাটাইতে হয় কাটাইব। এ ভীষণ জ্বালা আর সহ্য হয় না।"

এই ভাবিয়া তিনি অসময়ের এক মাত্র সম্বল—তাঁহার স্বামীর এক মাত্র আদরের ধন—সেই সুবর্ণ কঙ্কণখানা একখানা লিপিসহ স্বীয় পঞ্চমবর্ষীয় বালকের হাতে দিয়া এক জন প্রতিবেশী সমভিব্যাহারে সমিতিতে পাঠাইয়া দিলেন।

উঃ। কি উদারহৃদয়। সামান্য অবলা-হৃদয়ে কত বল। নিস্বার্থপরতার কত প্রবল প্রবাহ হৃদয়ে বহমান। এই প্রকার দেববালা অন্য জাতিতে আর কয় জনা মিলে ?

আমাদের হিন্দু মহিলাগণ সতীলক্ষ্মী। আমাদের হিন্দু মহিলাগণ অমায়িকতায় চিরবিভূষিতা. আমাদের হিন্দুমহিলাগণ সত্যবাদিনী,—বীরহৃদয়া। আমাদের হিন্দুমহিলাগণ গুণাবলীর আদর্শ স্থানীয়া বটে, কিন্তু আমরা —আমরা তাঁহাদের অনুপযুক্ত কুলাঙ্গার সন্তানগণ উক্ত গুণাবলীর পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাদিগকে জ্বলন্ত বহ্নিরাশি বক্ষে পোষণ করিতে দিয়াছি। —আমরা তাঁহাদিগকে জীবন্তে জ্বালাইয়া মারিতেছি।

আমাদের গবর্ণমেণ্টের সুশাসন-প্রভাবে আজ বঙ্গমহিলাগণ জীয়ন্তে আপন ইহপরলোক-সাক্ষী স্বামীর শেষশয্যায় শয়ন করিতে পারেন না বটে, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের অনেককেই বাল্যবৈধব্যানলের ভীষণ শিখায় আহুতি দিয়া জীয়ন্তে জ্বালাইয়া মারিতেছি।

উঃ! কি মর্ম্মস্পৃক ব্যাপার! যে সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা আপন স্বার্থ সঙ্গ, ধূলিখেলা ছাড়িয়া দু'দণ্ড অপর কথা ভাবিতে জানে না ; যে বালিকা পিতৃমাতৃ-অঙ্কত্যাগে অপর অঙ্কে যাইতে শিখে নাই, যে বালিকা চির-সরলতার কোলে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া জীবনের ক্ষুদ্র অংশটুকু কাটাইয়া আসিতেছে ; যে কুমারী আপন জনকজননীর সহোদর-সহোদরার পবিত্র ভালবাসা ভিন্ন অপর ভালবাসার কথা উপলব্ধিও করিতে পারে নাই, "প্রে" "ম" এই দুইটী শব্দ

কাহার কর্ণকুহরে এক সঙ্গে কোনও দিন প্রবেশ করিয়াছে কিনা সন্দেহ, সেই বালিকা, সেই দুগ্ধপোষা শিশু যদি আজ দৈববলে বা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে বৈধব্যের করালগ্রাসে পতিত হয় তবে তাহার উপায় কি ?

যে সকল সরলাবালা এত দিন সুখের কোলে লালিতা-পালিতা হইয়া সদানন্দে দিনগুলি কাটাইয়া আসিতেছে, আজ সে বৈধব্যের যন্ত্রণা সহ্য করে কি প্রকারে ? যে আপন পিতা মাতা সহোদর সহোদরার সঙ্গ ভিন্ন মুহূর্ত্তকালও কাটাইতে পারে নাই, আজ সে তাহার মাতৃ-পিতৃদত্ত জীবনসাথীর বিহনে নিরাশ্রয়াবস্থায় দিনগুলি কাটাইবে কি প্রকারে ?

যাহা হউক বুঝিলাম ক্রমে এই সকল যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া উঠিল। ক্রমে সব সহ্য হইতে চলিল।

কিন্তু মদন গোঁসাই যেদিন হেলিতে দুলিতে চঞ্চলচরণে আপন শিকার উদ্দেশে কামশরটুকু লইয়া অগ্রসর হইবেন সেই দিন এই নিরাশ্রয়া হরিণীকে আশ্রয় দিবে কে ? সেই দিন সে শরবিদ্ধ হইয়া কোন্ গভীর অরণ্যমুখে পলায়ন করিবে ? তখন তাহার চতুর্দ্দিকে শ্মশানানল বাড়বানলের মত ধুধু করিয়া জ্বলিতে থাকিবে। আপন প্রাণভয়ে যেই দিকেই প্রধাবিত হইবে, সে দিকেই অনল ;—কাজেই তাহাকে শিকারীর হাত এড়াইবার জন্য জ্বলন্ত অনলে পুড়িয়া মরিতে হইবে। উঃ বড়ই ভীষণ ব্যাপার। ইহার দিকে আর লিখনী অধিকতর অগ্রসর হইতে চায় না !

মীনধ্বজ ! তুমি বড়ই নিষ্ঠুর,—বড়ই উৎপীড়ক, জগতে তোমার জন্য কি যম নাই। তুমি পুড়িয়া ছাইভস্ম হইলেও তোমার মরণ নাই।

শ্রীদেবেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী।

যোধাবাই।

কঠোর কালের তর্জ্জনীহেলনে এই বিশ্বসংসার চলিয়া আসিতেছে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলেই কুটীল কালের অধীন। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দীর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সব যায—রাজা, প্রজা, ধনীর অট্টালিকা, নির্ধনের কুটীর, সব কালের গর্ভে লয় প্রাপ্ত হয়। থাকে কেবল মধুর স্মৃতি। যুগের পর যুগ অতীত হইয়াছে, সেই রামের অমরাবতীসদৃশ রাজধানী অযোধ্যা নগরী এক্ষণে কোথায় ? কালের অনন্ত গর্ভে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর দেখিবে—পাণ্ডবের সেই লোক-বিশ্রুত ইন্দ্রপ্রস্থ কোথায় ?—সেই বিশ্বধ্বংসী সকলই গ্রাস করিয়াছে—আছে কেবল মধুর স্মৃতি। সব যায়, কিন্তু স্মৃতির ধ্বংস নাই। তাই স্মৃতির যন্ত্রণা অতীব জ্বালাময়ী। আজ প্রায় সার্দ্ধতিনশত বৎসর অতীত হইল, পৃথিবী-বিশ্রুত সম্রাট জালালউদ্দিন মহম্মদ আকবর সাহ মর-জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছেন। তিনি গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার প্রস্ফুলিত নাট্যশালা সম প্রভাময়ী দিল্লী নগরীও মলিন হইয়া গিয়াছে। যাহা একবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা আর ফিরে না। আকবর গিয়াছেন, তাঁহার ভারতসাম্রাজ্য গিয়াছে, যে শস্যশ্যামলা, মলয়জশীতলা, ভারতভূমির উপর এক সময়ে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" রবে কোটী কোটী কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া অসীম অনন্ত আকাশের ক্রোড়ে বিশাইত, সেই ভারত আজ ব্রিটিশরাজের বিজয়পতাকা বক্ষে ধারণ

করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান আছে। কালের কি কঠোর বিদ্রূপ! সেকেন্দ্রার নিভৃত প্রান্তে যাও—কি দেখিবে?—এক মহান্ গম্ভীর সমাধিমন্দিরে এক মহাপুরুষ ধরণীর ক্রোড়ে তমসাময়ী অন্ধকারের গর্ভে চিরবিশ্রামলাভ করিতেছেন—আর তথায় সম্রাটের প্রেত-কামনায় জলদগম্ভীরস্বরে কোরাণের মন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হয় না—আর তথায় নহবতের করুণ হৃদয়স্পর্শী শোকধ্বনি নাই। সব নীরব! সব নিস্তব্ধ! ইহাও হয় ত নির্ম্মম কালের প্রভাবে বিলুপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সেই মহিমাময় সম্রাটের নাম কখনও বিলুপ্ত হইতে পারিবে না। নূতন মোগলসম্রাট আকবর ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েন। যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদিতে প্রথমে তাঁহাকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। সম্রাট প্রথমে অভিভাবক বাইরাম খাঁর অধীনে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন' পরিশেষে বাইরাম খাঁর আচরণে বিরক্ত হইয়া স্বয়ং শাসন-তরীর কর্ণধার হয়েন। রাজ্যে মধুর শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। সর্ব্বত্রোপযোগী প্রতিভা ও অসাধারণ ক্ষমতা লইয়া আকবর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রজারঞ্জনব্রতে তিনি তাঁহাকে আরও মহত্ত্বের তুঙ্গশৃঙ্গে উত্তোলিত করিয়াছিলেন।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় সম্রাজ্ঞী যোধাবাই। যোধাবাই আকবরের হিন্দু-বেগম ছিলেন এবং তিনিই প্রধানা বেগম হইয়াছিলেন। আমরা অদ্য তাঁহারই বিষয় বিবৃত করিব। কি উপায়ে আকবর তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই বর্ণনা করিব।

মোগল সম্রাটগণ পূর্ব্বপুরুষদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া "নওরোজ" অথবা "মহিলা-মেলায় প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যখন সম্রাট আকবর সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন—রাজ্যময় শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল—প্রকৃতিপুঞ্জ হর্ষে কালযাপন করিতে লাগিল, তখন সম্রাট পুরবাসিগণের অনুরোধে এক দিবস "নওরোজের" হুকুম দিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "নওরোজ" "মহিলা-মেলা"—ইহা রমণীর রূপের বাজার বলিলেও চলে। মহামান্য আমীর মহারাজ রাজদিগের ওমরাহ, বিদ্যুদ্দামসদৃশ লাবণ্যময়ী স্ত্রী-কন্যা-ভগ্নী এই বাজারের বিক্রয়েত্রী—স্বয়ং সম্রাট ও তাঁহার প্রিয় বেগমগণ ইঁহাদের এক মাত্র ক্রেতা।

এই সকল সুন্দরীর সন্নিকটে একটী প্রস্ফুটিত অশোক রক্ষের শ্যামল ছায়ায় বিচিত্র মর্ম্মর-আসনে এক পণ্যবীথিকা সজ্জিত করিয়া এক অসামান্যা সুন্দরী রাজপুত যুবতী বসিয়া আছেন। তিনি দিল্লীতে এই প্রথম আসিয়াছেন। এই সমুদায় দেখিয়া তাঁহাকে ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে বসিতে হইয়াছে।—তাঁহার রূপের জ্যোতিতে অশোকতল যেন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর দেখাইতেছিল। রমণী নীরবে বসিয়া আছেন। হঠাৎ এক তেজঃপুঞ্জ বিশাল বক্ষ রূপবান উজ্জ্বল পরিচ্ছদধারী যুবক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে দুইটী সুন্দরী কিশোরী পরিচারিকা।—যুবতী শশব্যস্তে দেখিলেন যে ভারত সম্রাট আসিয়াছেন। সেই সুন্দর রাগরঞ্জিত রক্তিম কপোল লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি ব্রীড়া বনতমুখী হইয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরমুহূর্ত্তেই সেই তেজোমূর্ত্তি আর দেখিতে পাইলেন না সম্রাট প্রস্থান করিয়াছেন। যুবতী দাসীকে শিবিকা আনিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন সন্ধ্যার ঈষৎ ছায়া গগনপটকে ধীরে ধীরে আবৃত করিতেছিল। শুক্লপক্ষের দশমীর চন্দ্র আকাশে প্রকাশ পাইতেছিল। যুবতী শিবিকারোহণে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। বাহকগণ আদিষ্ট হইয়া সেই যুবতীকে অনতিবিলম্বে বহন করিয়া যাইতে লাগিল। প্রথম দ্বারে শিবিকা উপস্থিত হইবামাত্র দ্বার মহাশব্দে রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি দ্বিতীয় দ্বারে যাইবার জন্য বাহকগণকে আদেশ করিলেন। তথায়ও ঐ প্রকারে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ

সব দ্বারই ঐ প্রকার রুদ্ধ হইল দেখিয়া যুবতী বিরক্ত হইয়া শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি পদব্রজে সপ্তম দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। শ্রমবিষাদজনিত মুখকমল তখন বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। মৃদু সমীরণ বহিতেছিল। উপরে চন্দ্রমা পূর্ণমাত্রায় স্থান অধিকার করিয়া হাস্য করিতেছিলেন—সে ত কাহারও ভাল দেখিতে পারে না, এক জনের সুখ তাহার প্রাণে বিষ ঢালিয়া দেয়—তাই যুবতীর কষ্ট দেখিয়া চন্দ্রমা হাসিতেছিলেন। যুবতী দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সে রুদ্ধদ্বারে প্রহরীস্বরূপ সেই তেজোঃকান্তি যুবক একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যুবতী নতজানু হইয়া যুক্তকরে বলিলেন, 'জাঁহাপনা, এ অধিনীর সহিত এ রহস্য কেন প্রভু। দ্বার খুলিয়া দিবার অনুমতি প্রদান করুন, দাসী নিষ্ক্রান্তা হউক।

যুবক তদুত্তরে বলিলেন। সুন্দরি। আমার মন-প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া কোথায় পলায়ন করিবে, আর যাইবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? এই রাজ-প্রাসাদ তোমার ন্যায় ত্রিদিব সুন্দরীকে বক্ষে ধরিতে পারিলে পবিত্র ও আলোকিত হইবে।" যুবতী বলিলেন, "এ দাসীর সহিত পুনরায় কেন রহস্য করিতেছেন। জাঁহাপনা আমি অতি নগন্যা—আমাকে যাইবার অনুমতি প্রদান করুন।" সম্রাট বলিলেন "সুন্দরি! আমি হিন্দুস্থানের বাদসা, কিন্তু আজ তোমায় দেখিয়া আমি তোমার ক্রীতদাস হইয়াছি। আমি তোমার পরিচয় গ্রহণ করিয়াছি, চল তুমি আমার অঙ্কলক্ষ্মী হইবে।" কিশোরী কহিলেন, "জাঁহাপনা। দাসী চরণ-সেবা করিবার উপযুক্ত নহে আর কেন আমায় এরূপ বলিতেছেন আমি স্বাধীনা নহি—আমার ভ্রাতা আছেন। আপনি ত অবগত আছেন যে, হিন্দুস্থী লোকেরা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ পরাধীনা—আমায় দয়া করিয়া বিদায় প্রদান করুন। রজনী গভীরা হইতেছে।"

সম্রাট বলিলেন, সুন্দরি! তোমার কথা সত্য আমি তোমার ভ্রাতার নিকট—সম্বাদ প্রেরণ করিব। কিন্তু তুমি আমায় বল, যে আমার হৃদয়েশ্বরী হইবে, আমার প্রধানা বেগম হইবে। ঐ দেখ সুধাংশু বিমল কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া শোভা পাইতেছেন—আকাশ অসংখ্য তারকা রাজি বক্ষে ধারণ করিয়া কেমন খেলিতেছে; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে তুমি আমার সহিত সিংহাসনে উপবেশন করিবে, রত্নমুকুট আমি তোমার পদতলে রাখিতেছি, বল তুমি আমার হৃদয়রাজ্যের একমাত্র অধিশ্বরী হইবে? সেই রত্নফলক-খচিত বহুমূল্য উষ্ণীষ খুলিয়া সম্রাট সেই যুবতীর পদমূলে রক্ষা করিলেন। যুবতী অতি যত্নে তাহা উঠাইয়া লইয়া চুম্বন করিলেন এবং আকবরের মস্তকে পরাইয়া দিলেন। শিবিকা আসিল যুবতী বিদায় লইলেন। সম্রাট সেই লোকললামভূতা ত্রিভুবন সুন্দরীর রূপের জ্যোতিতে দগ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুর অভিমুখে গমন করিলেন।

কি করিয়া এই সুন্দরী—রত্নকে বক্ষে ধারণ করিবেন, এই চিন্তাই তিনি অহোরাত্র করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে বিষম ঝটিকা বহিতে লাগিল। একবার ভাবিলেন—যে, নিজ আয়ত্তে পাইয়া অমূল্যরত্নকে অগাধ জলধিজলে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। আবার ভাবিলেন রাজপুত কেনই বা ইসলামের সহিত কুটুম্বিতা সুত্রে আবদ্ধ হইবে।

চিন্তাবিষে তিনি বড়ই কাতর হইলেন। রাজকার্য্য তাঁহার তিক্তবোধ হইতে লাগিল। আবার ভাবিলেন যে উদয়সিংহ মাররারের ক্ষুদ্র অধিপতি যদি তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহার ভগ্নিকে গ্রহণ করেন, সে কি করিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে যদি সমস্ত রাজপুত জাতি যোগদান করে তবে ব্যাপার বড় আয়াস-সাধ্য হইবে। হিন্দুস্থানের মহাপরাক্রান্ত সম্রাট একটী বালিকার রূপে উন্মাদ হইলেন। ছলে বলে কৌশলে বা মিষ্টকথায় যে প্রকারে হউক, সেই রমণীরত্নকে তিনি হস্তগত করিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। অনেক ভাবিয়া তিনি উদয়সিংহের নিকট কয়েকজন, সুবিজ্ঞ আমীর দূত প্রেরণ করিলেন। ইহাদের সহিত তিনি প্রচুর উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। কেবল বিবাহ প্রস্তাব

করিবার নিমিত্তই এই সকল আয়োজন। সম্রাট দূত প্রেরণ করিয়া আবার মহা চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। দূতেরা মারবারের রাজধানী যোধপুরে উপস্থিত হইলে, মহারাজ উদয়সিংহ বিশেষরূপে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ক্রমে তাঁহারা তাঁহাকে বিবাহের প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন।

উদয়সিংহ মহাসমস্যায় পতিত হইলেন। যদি তিনি ভগিনীর অমতে—আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের অমতে—এই উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তবে মহা বিপদে পড়িবেন। তিনি দূত সকলকে আরও কিছু দিবস অবস্থান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন।

উদয়সিংহ আকবরের ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে মনস্থ করিলেন। সম্রাটের সহিত বিবাহ কখনও সম্ভবপর নহে। যে অসামান্য পুরুষের চরণে সমগ্র ভারতভূমি অবনত—যাঁহার তর্জ্জনী হেলনে শত উদয়সিংহ বাত্যাহত ধূলিরাশিরন্যায় উড়িয়া যাইতে পারে, তাঁহার সহিত বাদবিসম্বাদ করা মূর্খের কার্য্য। বুদ্ধিমান চতুর উদয় ভাবিলেন, একবার ভগিনীর সম্মতি পাইলেই এই কার্য্য স্থির করিবেন।

যোধাবাই সম্মতি সূচক আভাস জ্ঞাপন করিলে, উদয়সিংহ মহানন্দে স্বীয় ভগ্নীকে মুসলমান সম্রাটের অঙ্কলক্ষ্মী হইবার সম্মতি প্রদান করিলেন। মহা সমারোহে আকবরের সহিত হিন্দু রাজপুত রমণী যোধাবাইয়ের শুভ পরিণয় সম্পাদিত হইয়া গেল।

গর্ব্বিত রাঠোরকুল এইজন্য যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইলেন। তাঁহারা অবমাননায় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত একত্র হইলেন, কিন্তু মোগল সৈন্যের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া গর্ব্বিত উদয়সিংহ একে একে তাঁহাদিগকে পদানত করিলেন। এই সময়ে একমাত্র আজমীর প্রদেশভিন্ন মারবারের সমস্ত দেশ তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। তাঁহার রাজকোষ অর্থে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যোধাবাই বিবাহান্তে দিল্লীতে আসিয়া প্রধানা বেগম হইলেন। তিনি স্বভাবগুণে আকবরের আরও প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই সম্রাট তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সদ্‌গুণ রাজীতে আরও আকৃষ্ট হইলেন। যোধাবাই দিল্লীনগরের প্রাসাদে স্বতন্ত্র মহলে অবস্থান করিতেন। তাঁহার সমস্ত হিন্দু-দাসদাসী ছিল। তিনি যে মহলে অবস্থান করিতেন, তাহা "যোধবাই-মহল" নামে খ্যাত ছিল এই মহলে ভিত্তিগাত্রে কার্ণিশের নীচে নানাবিধ হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, হিন্দু রাজকুমারেরা তথায় স্বস্ব ধর্ম্মানুসারে হোমযজ্ঞাদি করিতেন। আকবরসাহ অগ্নি উপাসক ছিলেন। অনেক সময় তিনি রাজপুতদিগের প্রদত্ত হোমের তিলক, হিন্দুধর্ম্মানুরাগের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার প্রশস্ত ললাটে ধারণ করিতেন। এই যোধবাই যুবরাজ সেলিম অর্থাৎ সম্রাট জাহাঙ্গীরের গর্ভধারিনী। যোধাবাই মুসলমান পত্নী হইলেও হিন্দুরমণী তিনি স্বভাবগুণে আকবরের অতিশয় প্রিয়তমা হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানকে সমতাসূত্রে গ্রথিত করিবার পরামর্শ আকবরকে প্রদান করিতেন। আকবরসাহ বিশালভাবতে হিন্দু প্রজাদের প্রাণে আপন ছবি অঙ্কিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন এবং তাঁহার এই সাধু ও মহৎ সংকল্প সুসাধিত হইয়াছিল। কি রাজপুত, কি মারাঠী কি পাঞ্জাবী, কি বাঙ্গালী সকল জাতীই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। সকলেরই তিনি পূজ্য ছিলেন। ঐতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অবগত আছেন। যোধবাই সর্ব্বগুণান্বিতা রমণী ছিলেন। স্বদেশহিতৈষিতা, পরোপকারিতা, দানশীলতা, অমায়িকতা প্রভৃতি অনেকগুলি শ্রেষ্ঠগুণ-রাজীতে তিনি ভূষিতা ছিলেন। তিনি জটিল রাজনীতিতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। আকবরসাহ অনেক কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতেন।

এই সদ্‌গুণরাজি-ভূষিতা হিন্দুকুলোত্তমা রমণী ১৬ • খৃঃ অঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুতে আকবরসাহ অতীব শোক পাইয়াছিলেন। রাজকার্য্যে আদৌ মনোনিবেশ

করিতেন না। সদাই নীরবে বসিয়া তাঁহার ধ্যানের মূর্ত্তি হৃদয়পটে অঙ্কিত করিতেন। সম্রাট অতিশয় অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। অশৌচান্তে তিনি হিন্দুনীতি অনুসারে সমস্ত প্রধান হিন্দুমুসলমান আমির ওমরাহদিগকে দাড়ী গোঁফ কামাইতে আদেশ করিয়াছিলেন।

যোধাবাইয়ের সুন্দর সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইল। তাঁহার মৃত্যুরপর সম্রাট নৌরোজের উৎসব বন্ধ করিয়া দেন। সম্রাট আকবরসাহ প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে রাজকার্য্য হইতে বিদায় লইয়া আপন প্রিয়তমা পত্নীর সমাধিমন্দিরে উপস্থিত হইতেন। নীরবে অশ্রুজলে তাঁহার মধুর স্মৃতির পূজা করিতেন। সহস্তে প্রস্ফুটিত প্রসূনরাজী সমাধিগাত্রে বর্ষণ করিতেন। আকবর যোধাবাইয়ের সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন। যতদিন আকবর ও জাহাঙ্গীর বাদসাহ জীবিত ছিলেন, তত দিন এই মন্দির অতি সুযত্নে রক্ষিত ছিল। প্রহরীরা সশস্ত্রে ইহার চারিদিকে পাহারা দিত। আজ চক্রনেমির পরিবর্ত্তনে সেদিন গিয়াছে; আজ যেথায় হিন্দুস্থানের সম্রাটের প্রিয়তমা পত্নী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন, সেই স্থানে ইংরাজরাজ গোলন্দাজদিগের চাঁদমারী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আজ ইংরাজের গোলা সশব্দে গর্জ্জন করিয়া তত্রত্য পবিত্র মৃত্তিকা কম্পিত করিতেছে। যেখানে এক সময়ে কাক পক্ষী যাইতে পারিত না, মনুষ্য দূরের কথা,—আজ সেই স্থানে অসংখ্য পকষদৃষ্টি কঠোর কায় সৈন্যগণ প্রফুল্ল মনে বিচরণ করিতেছে। যাহা ছিল, তাহা গিয়াছে, কেবল ক্ষীণ স্মৃতি এখনও মধ্যে মধ্যে হৃদয়কে আন্দোলিত করে। তাই বলিতেছিলাম, নির্ম্মম কালের কি কঠোর বিদ্রূপ!

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

লুকোচুরি।

নয়ন যবে মোর মুদিত থাকে
তখন তোমা বুঝি ভাল.
কোথায় "ধর" বলে লুকায়ে গেলে,
নয়নে দিয়ে মায়া আলো,
কেবলি চুপে চুপে ঘুরে ফিরে,
আকুল হয়ে খুঁজি আঁখিনীরে,
কখনো ফুলে, কভু নদী—তীরে,
হিয়া যে মোর ভেঙ্গে এল;
নয়ন যবে মোর মুদিত থাকে
তখন তোমা বুঝি ভাল।
কখনো তুমি ভেবে বনের মাঝে
লুক্কায়িত ঘন বীথি হতে,
ধরিয়া ফুল, পাখী, মরেছি লাজে
হাসিছ তুমি দূর পথে।

নিকটে যারা ছিল আপন জনা—
সুধায় কেহ 'যাও তুমি কোথা',
কেহবা হেরে ম্লান অশ্রুকণা,
হাসিয়া উঠে হেথা হোথা।
হাসির স্বর তব শোনা যায়,
সদ্য পদাঙ্ক হৃদে ভায়,
তবু ও তোমা দেখা নাহি যায়—
কে জানে একি মাদকতা।
খুঁজিয়ে নেব হইল বাজি,
হারায়ে হারি, এতদিন;
হাসিয়ে তুমি এস আবার আজি
চোখের কাছে নূতন।

শ্রীধীরেন্দ্র লাল চৌধুরী—

দেবতা-দাদা।

(সত্য ঘটনা-মূলক গল্প)

সুরেশচন্দ্র সান্যাল ভাগলপুর সহরের এক অংশে একটী 'মেসে' থাকিয়া টি, এন জুবিলি কলেজে এফ, এ, পড়েন। পড়াশুনায় বিশেষ মনোযোগের জন্য সুরেশচন্দ্র অধ্যাপকগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ; আর স্বভাবের গুণে তিনি স্থানীয় পরিচিত সকলেরই স্নেহ-ভাজন। ছাত্রাবাসের দ্বিতলে যে ঘরটিতে সুরেশচন্দ্র থাকেন, সে ঘরটি একটী ছোট কুঠারী। তাহাতে একজন মাত্র যুবকেরই স্থান আছে। ঘরটির পূর্ব্বে একটি দরজা, তাহার সম্মুখে ছোট একটি বারান্দা। উত্তরে আর একটি দরজা আছে, সেটি দিয়া দ্বিতলের হল বারান্দায় যাওয়া যায়। পূর্ব্বে দুই পাশে দুইটী এবং দক্ষিণে একটি জানালা আছে। এই দক্ষিণের জানালার নিচেই আর একটি ভদ্রলোকের বাড়ী। যে বাড়ীটি একতলা, তাহার ছাদে উঠিবার সিঁড়ি ঠিক এই জানালার দুহাত পশ্চিমের দিকে। জানালার ঠিক সম্মুখে উঠান খোলা। দুই বাড়ীটীরই চারি দিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এই জানালা খুলিয়া তাহার কাছে বসিলে নিচের বাড়ীর উঠানে যদি কোন লোকে আসিয়া দাড়ায় তো বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সিড়ি দিয়া কেহ ছাদে উঠিলে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই নীচের বাড়ীটি একটি ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণ জীবিত নাই, তাহার বিধবা পত্নী, ষোড়শ বর্ষ বয়স্কা একটি কন্যা, আর পঞ্চ-বিংশ বৎসর বয়স্ক উপযুক্ত পুত্র আছেন। একটী সবৎসা গাভী, একটী কালো জোবাল কুকুর আর ৩টি শাবক সহিত এক বিড়ালী ইহারাও ঐ পরিবারের পোষ্যের অন্তর্গত। পুত্র-বিদেশে চাকরী করেন, সপত্নীক তথাতেই প্রায় থাকেন ; পূজার সময় বাড়ী আসেন। বিধবা গিন্নি দুহিতাটীকে লইয়া বাড়ীতে থাকেন জামাতার সাংসারিক অবস্থা বড়ই অস্বচ্ছল, এজন্য কন্যার শ্বশুরালয় গমনের যন্ত্রণা খুব কমই ভোগ করিতে হয়। জামাতা বাবাজী মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই চারি দিন থাকিয়া যান বটে কিন্তু কন্যার বিরহ বেদনার তাহাতে কোন শান্তির ব্যবস্থা হয় না, কারণ কি জানি কি কারণে স্বামী-গৃহে পদার্পণ করিলেই কিশোরী-কম্পিতা হইয়া একেবারে মূর্চ্ছিতা হয়, সুতরাং বেচারা জামাইকে ঘরের কড়ি বরগার পৌনঃপুনিক গণনার দ্বারাই শ্বশুরালয় আগমনের সুখ ভোগ আদায় করিয়া লইতে হয়।

এরূপ গৃহিনী সম্ভাষণে আসিবার জন্য জামাই বাবাজীর চিত্ত যত দূর লালায়িত হই-বার সম্ভব তাই হইয়া থাকে, শাশুড়ীর অনুরোধ উপরোধে যখন তিনি নিতান্তই অতিষ্ঠ হইয়া পড়েন, তখনই এক বার নিয়ম-রক্ষার খাতিরে প্রকৃতই শাশুড়ীর শ্রীচরণ দর্শন জন্য ৪।৫ মাস অন্তর শ্বশুরালয়ে আগমন করেন। বিধবা গিন্নি কন্যার এই দোষ প্রশমনের জন্য, সন্ন্যাসী, ফকির, ওঝা প্রভৃতির ঝুলির ঔষধ এবং নিজ বাক্সের টাকা প্রায় নিঃশেষিত করিয়াছেন, কিন্তু এ দুরন্ত রোগ কিছুতেই ভাল হয় নাই। আজ কাল গিন্নি একরূপ হতাশই হইয়া পড়িয়াছেন। এখন কেবল তিনি 'বাবা বুড়ানাথের' চরণে তাঁর 'প্রভার' মঙ্গলের আবেদন জানাইতেছেন আর রোজ সন্ধ্যাকালে বাবার চরণামৃত আনিয়া প্রভাবতীর মাথায়, বুকে দিতেছেন এবং পান করাইতেছেন। প্রভাবতী দেখিতে খুব সুন্দরী না হইলেও কুৎসিতা নহে। নবযৌবনের প্রবল তরঙ্গে হৃদয়-সরসী কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া টলমল

করিতেছে, অঙ্গে অঙ্গে সৌষ্ঠবপূর্ণতা আপন গর্ব্ব প্রচার করিতেছে; স্নিগ্ধোজ্জ্বল গৌরকান্তি যেন সে রূপ-গৌরব শত গুণ প্রতিফলিত করিতেছে।

প্রভাবতী স্বামীর সঙ্গ হইতে দুর্দ্দৈব গুণে বঞ্চিতা হইয়াও এ পর্য্যন্ত স্বভাবের পবিত্রতা বিশেষ রূপেই রক্ষা করিয়া আসিতেছে, গৃহিণীরও সে বিষয়ে অনেকটা দৃষ্টি আছে। ষোড়শী যুবতী এখনও বিড়ালশাবকগুলি লইয়া খেলা করে, তাহাদিগকে নাচায়, চুমো খায়, মাথায় করে, বুকে করে তাদের পাছে পাছে দৌড়াইয়া যায়। কখন বা কুকুরটার কাণ ধরিয়া এধার ওধার টানাটানি করে; আবার কখন বা কাঁথা কি কার্পেট লইয়া সূচী-কর্ম্ম-নৈপুণ্যশিক্ষা করে। মাযের গৃহকর্ম্মেও তাহাকে কম সাহায্য করিতে হয় না। এইরূপ নানাবিধ কার্য্যব্যপদেশে সে তাহার বিফল যৌবনের দিনগুলির সাফল্য-সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকে।

সুরেশচন্দ্র মার্জ্জিত স্বভাবের যুবক। দেখিতে শুনিতে বেশ সুন্দর। তাঁর গৌরকান্তি, আকর্ণ-বিস্তৃত পদ্মপলাশলোচন, বিনা রাগে স্বভাবরঞ্জিত ওষ্ঠদ্বয়, মধুর হাসি হাসি মুখ এবং সুমিষ্ট কথা সকলেরই চিত্ত হরণ করে। তিনি জানালা খুলিয়া মধ্যে মধ্যে প্রভাবতীর খেলা দেখেন; চোকো চোকিও যে না হয় তাহা নহে। আবার অমনি সেদিককার জানালা বন্ধ করিয়া দেন। কি জানি সে কি মনে করিবে। কিন্তু আবার না খুলিয়াও থাকিতে পারিতেন না। যৌবনোচিত সৌষ্ঠবসম্পন্ন রমণী-সৌন্দর্য্য-দর্শনের প্রলোভন পরিত্যাগ করা বড় সহজ নহে; তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এইরূপ দর্শনের সঙ্গে যে কাম লালসার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিবেই ইহার কোন অর্থ নাই। সৌন্দর্য্যের এমনই একটা আকর্ষণ [illegible] নয়ন সাগ্রহে সেদিকে ধাবিত [illegible] তাঁহার মনে কি ভাব ছিল তাহা বলিতে পারি না, তবে তাঁহার স্বভাব এ পর্য্যন্ত পবিত্র ছিল। কোন কুবাসনা তাঁহার মনে উদয় হওয়ার ভাব কিছু প্রকাশ পায় নাই। অনেক সময়ে প্রভাবতীর সহিত তাঁহার চোকো চোকি হইত। প্রভাবতী একটু মুচকি হাসিয়া সরিয়া যাইত; আবার কার্য্যব্যপদেশে হয় ছাদে, না হয় প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইত। এইরূপেই কিছুদিন কাটিতেছিল। ছাত্রাবাসের আর কোন বালক ইহার বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই।

(২)

পৌষমাস। বড়দিনের ছুটীতে ছাত্রাবাসে আর সকল বালকই স্ব স্ব আবাসে পায়স পিষ্টকের আস্বাদনের আশায় গমন করিয়াছেন কেবল সুরেশ চন্দ্র পরীক্ষা নিকট বলিয়া বাড়ী যান নাই। বাসায় চাকর ও পাচক সহ তিনি অবস্থান করিতেছেন। পাচক ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্নের ভোজনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পরই চলিয়া যায়, ভৃত্যও তৎপরবর্ত্তী তদীয় কর্ত্তব্য শেষ করিয়া হাতে চুণ ও দোক্তা টিপিতে টিপিতে ভৃত্যগণের আড্ডায় একটু আরাম করিতে যায় সুতরাং বেলা ১২টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত সুরেশ চন্দ্র সাধারণতঃ একাকীই থাকেন। মধ্যে মধ্যেও কোন সমপাঠী বান্ধব আসেন বটে তবে সে বড়ই কম।

এইরূপ একাকী অবস্থানের অবস্থার তৃতীয় দিবস সন্ধ্যাকালে সুরেশচন্দ্র বেড়াইয়া বাসায় ফিরিলেন এবং ভৃত্যকে নিজের ঘরের বাতি জ্বালিয়া দিতে আদেশ করিলেন; ভৃত্য রাম-খেলাওন বাবুর 'জুয়েল ল্যাম্প' জ্বালিয়া দিয়া গেল। সুরেশ ঘরে আসিয়া দক্ষিণদিকের জানালা বন্ধ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন জানালার নীচে একখানা কি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে, কিসের কাগজ দেখিবার জন্য তিনি উহা হাতে করিলেন, দেখিলেন একখান খামে ভরা চিঠি। তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া, কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে আলোক নিকটে গিয়া পত্রখানি উন্মোচন করিয়া পাঠ করিতে বসিলেন; পত্রখানি রমণী হস্তলিখিত, তাহাতে নিম্ন-লিখিত কথাগুলি ছিল;—

"এমন করিয়া আর পারি না! আমাকে কেন আপনি, পাগল করিলেন? যদি পাগল

করিলেন তবে কেন অনুগ্রহ করেন না আমি এ হৃদয় আপনাকে দিয়াছি। ভালবাসা কাকে বলে তা আমি বেশ বুঝিতেছি। আর নীরবে থাকিতে পারি না। জানি না এ তুচ্ছ হৃদয় লইবেন কি না। আপনার একটি কথার অপেক্ষায় আছি। সুবিধা চলিয়া যায়! ইহার একটা উত্তর চাই। দয়া করিয়া দিবেন কি? ছাদে ফেলিয়া দিবেন, আমি সতর্ক থাকিব! যদি হৃদয়ে আশা জন্মাইয়াছেন, তবে শেষে নিরাশ করিবেন না এই প্রার্থনা। মনে বলিতেছি কতই লিখি কিন্তু আজ আর নয়। ইতি—"

সুরেশ পত্রখানি যেমন পড়িতে লাগিলেন, অমনি তাহার হৃদয়ের আন্দোলন প্রভাব-কম্পিত হস্ত প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিল, তাঁহার বুকের মধ্যে যে একটা প্রবল তুফান উঠিয়াছে তাহা তাঁহার চোক, মুখ, হাত সব সহস্র প্রকারে ঘোষণা করিতে লাগিল, সেই পৌষ মাসের দিনেও সুরেশের কপালে ঘর্ম্ম-বিন্দু দেখা দিল—শুধু দেখা নয়, কপাল হইতে টস্ টস্ করিয়া হস্তস্থিত পত্রের উপর পড়িয়া পত্রের অক্ষরগুলিকে মলিন করিয়া তুলিল। একবার, দুইবার, তিনবার, তিনি সে পত্র পড়িলেন,—ঘর তাঁহার নিকট বড় গরম বোধ হইতে লাগিল, জানালা দরজা খুলিয়া দিয়া পত্রখানি হস্তে ধারণ করিয়া তিনি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভাবতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দ্বারা যুদ্ধ তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত করিয়া তুলিল, তিনি অবশ হইয়া পড়িলেন।

প্রবৃত্তি নিবৃত্তির তুমুল সংগ্রাম সুরেশচন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিল। প্রবৃত্তি তাঁহাকে এমন সুযোগ, সুখলিপ্সা পরিতৃপ্তির এমন উপায় পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিল। সে বলিতে লাগিল তুমিতো নিজে তাহাকে প্রলুব্ধ কর নাই, নিজে তাহাকে সৎপথ ভ্রষ্ট করিতে কোন চেষ্টা কর নাই, নিজ হইতে উপযাচিকা হইয়া যে হৃদয় দান করিতে আসিয়াছে তাহাকে ফিরাইও না, তাহার হৃদয় যখন অসৎ পথের দিকে ধাবিত হইয়াছে, তখন তুমি না হয় অন্য কেহ তাহার লালসা-পূর্ণ করিবে; সুতরাং তুমি কেন এ সুযোগ পরিত্যাগ কর? এই পরামর্শের সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তি তাঁহার মানস নয়ন সম্মুখে যে মোহন সুখের চিত্রপট উন্মোচিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিল তাহাতে তাঁহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহিতে লাগিল, তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন তখন নিবৃত্তি ধীরে ধীরে তাহাকে বলিতে লাগিল 'ছি। তুচ্ছ লালসার মোহে ভুলিয়া ক্ষণিক সুখের প্রত্যাশায় অমূল্য চরিত্ররত্ন বিসর্জ্জন দিবে? পথভ্রান্ত অবোধ বালিকার উন্মত্ততায়, উত্তেজনায় তাহাকে চিরকালের তরে নরকে নিমজ্জিত করিবে? স্বীয় সংযম, মান, প্রতিষ্ঠা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া কি এক মোহের ছলনায় ভুলিতে চলিয়াছ। এই সম্মুখে পরীক্ষা, যাহার জন্য পিতা মাতার স্নেহময় ক্রোড় পর্য্যন্ত ভুলিয়া এই ভাগলপুরে পড়িয়া আছ, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ? তোমার অধ্যাপকবর্গ তোমাকে প্রাণতুল্য স্নেহ করেন, তাহারা যদি শুনেন তবে কি মনে করিবেন। দুষ্কার্য্য কখন গুপ্ত রহিবে না, প্রকাশ হইয়া পড়িলে তখনকার অবস্থা কি হইবে একবার ভাবিয়া দেখ! চরিত্রের স্খলন একবার হইলে আর তাহা নির্দ্দোষ থাকে না—তাহার সে কলঙ্ক-কালিমা কিছুতেই ঘুচে না, এ কথা স্মরণ রাখিও!" ইত্যাদি প্রকার নিবৃত্তির তিরস্কারে আবার তিনি অন্যভাবে অস্থির হইতে লাগিলেন।

পাচক রুটী তৈয়ার বলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল তিনি বলিলেন ঘরে ঢাকিয়া রাখিয়া চলিয়া যাও। সে তদনুসারে খাবার ঢাকিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। তিনি ঘর বন্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কোন কুল পাইলেন না। প্রবৃত্তির মন্ত্রেই তিনি যেন চালিত হইবেন এইরূপ বোধ হইতে লাগিল, প্রবৃত্তির মোহ-মদিরায় উত্তেজনা যতই অধিক হইতে লাগিল নিবৃত্তির নিষেধ বাণী ততই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ তরভাবে তাঁহার কাণে ধ্বনিত হইতে লাগিল, আকাশের বায়ুতে সয়তান আনন্দে নৃত্য করিতেছে-দেবদূতগণ

ম্লানমুখে তাহার দিকে দেখিতেছেন। এই অবস্থায় বহুক্ষণ কাটিল। কিন্তু নিবৃত্তির বাণীর সম্বন্ধে সুরেশ কর্ণের বধিরতা সম্পাদন করিতে পারিলেন না—প্রবৃত্তির প্রবল নেশার ঝোঁকের মধ্যেও তাঁর কাণে নিবৃত্তির ক্ষীণ স্বর বাজিতে লাগিল "সাবধান, সাবধান, সাবধান।"

বিকল চিত্ত সুরেশ চন্দ্র তখন শয্যা ত্যাগ করিয়া মেজেতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আকুলপ্রাণে ভগবানের চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া ডাকিতে লাগিলেন "হে দয়াময়, হে বিপদের কাণ্ডারি, দুর্ব্বল হৃদয় প্রলোভনের আকর্ষণে বিধ্বস্ত হইতেছি, আমার এমন বল নাই প্রভো। যদ্বারা তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারি। তুমি দয়া করিয়া তাহাকে বলীয়ান্ কর! কি মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিল প্রভো! কি কুহকে ভুলিলাম। আমি ডুবিতে বসিয়াছি, ডুবিয়াছি, তোমার ঐ মঙ্গল হস্ত বাড়াইয়া দিয়া আমাকে তুলিয়া দাও প্রভো, চারিদিক হইতে প্রলোভন আমাকে সজোরে আকর্ষণ করিতেছে, আর যে হৃদয় ঠিক রাখিতে পারি না প্রভো!" এইরূপে সুরেশচন্দ্র বহুক্ষণ ধরিয়া ভগবানের চরণে আত্ম নিবেদন করিলেন, আর মেজেতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, পৌষ মাসের রাত্রি অতিবাহিত হইতে চলিল, সুরেশ তাহা বুঝিতেই পারিলেন না; আহার্য্য সামগ্রী যেমন তেমনই পড়িয়া রহিল, তাহার কথাও তাঁহার মনে নাই, তিনি কেবল ব্যাকুল-প্রাণে কাঁদিতেছেন, আর দয়াময় শ্রীহরির চরণে হৃদয়ের বল ভিক্ষা করিতেছেন, এইরূপে প্রায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, উষার ক্ষীণ আলোক রেখার সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ চন্দ্রের হৃদয়ে ভগবানের স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিকাসিত হইল; তাঁহার হৃদয় নববলে বলীয়ান হইয়া প্রশান্ত হইল; তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গিয়াছে—সানন্দে সুরেশচন্দ্র উঠিয়া গলবস্ত্রে সেই পরম দেবতার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া তৎক্ষণাৎ কাগজ কলম লইয়া লিখিলেন।

আপনার আমার প্রতি স্নেহভাবের বিষয় জ্ঞাত হইয়া পরমানন্দিত হইয়াছি কিন্তু আপনি যে ভাবে আমাকে সেই স্নেহ দান করিতে ইচ্ছুক, ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া, সম্মানের দিকে তাকাইয়া, আপনার দিকে তাকাইয়া ও আমার দিকে তাকাইয়া আমি তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম, ক্ষণিক লালসার তৃপ্তির জন্য অমূল্যরত্ন বিসর্জ্জন দিতে চাহেন কেন? প্রবৃত্তির পথে সুখ নাই, নিবৃত্তিতেই সুখ। আপনি এখনও অধিক অগ্রসর হন নাই, এখনও বুঝিয়া দেখিয়া সংকল্প ত্যাগ করুন, আপনার চরণে এই প্রার্থনা। আপনাকে আমি স্নেহ করিতেছি, মনে করিবেন না যে আমি ঘৃণা করিতেছি। ভুল ভ্রান্তি সকলেরই হয়, তাহাতে বেশী দোষ হয় না কিন্তু ভুল সংশোধনে ঔদাসীন্যই দোষের আকর। আপনাকে চিরদিন নিজসহোদরা ভগ্নীর মত স্নেহ করিব এবং আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশলের জন্য ভগবানের চরণে নিয়ত প্রার্থনা করিব। আমাকে আপনি সহোদর তুল্য জ্ঞান করিলে কৃতার্থ হইব। পত্র লিখিয়া দক্ষিণের জানালা খুলিলেন এবং পত্র ফেলিয়া দিলেন। উহা পড়িবামাত্র একখানি উৎসুক হস্ত তাহা কুড়াইয়া লইয়া গেল।

পরদিন সুরেশচন্দ্র দক্ষিণদিকের জানালা আদৌ খুলেন নাই। গত রাত্রিতে সারারাত্রি মেজেতে পড়িয়া হিম ভোগ করায় পরের দিবস তিনি অসুস্থতা বোধ করিলেন। সর্দ্দি, হাত পা কামড়ানি এবং গলার মধ্যে অসহ্য বেদনায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। সেদিন কিছু আহার করিলেন না, গরমজল আদি মুষ্টি যোগের ব্যবস্থা করিলেন। পরদিন প্রাতে শরীর আরও বেশী খারাপ বোধ হওয়াতে ডাক্তার ডাকাইলেন; ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া হিম লাগাকেই অসুখের কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন এবং একটা ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়া গেলেন; আর বলিয়া গেলেন গলার মধ্যে গরমজলের বাষ্পের দ্বারা সেক দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সুরেশচন্দ্র ডাক্তারের ব্যবস্থানুসারে গলায়

কম্ফাটার জড়াইয়া ফ্লানেলের কোট দেহ আবৃত করিয়া কম্বল গাযে দিযা বিছানায় পড়িলেন। চাকর গরম জল গাড়ুর মধ্যে দিয়া বাষ্প গ্রহণের ব্যবস্থা করিল।

দ্বি প্রহরে পাচক ও ভৃত্য চলিয়া গিযাছে একাকী সুরেশচন্দ্র কম্বল মুড়ি দিযা চক্ষু মুদ্রিত করতঃ শযনে আছেন. ইতি মধ্যে তাঁহার বোধ হইল যে কোন মানুষের পদশব্দ তাঁহার কাণে গেল। কম্বল সরাইযা তিনি দরজার দিকে তাকাইলেন —যাহা কখনো স্বপ্নেও ভাবেন নাই তাহাই হঠাৎ তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইল, নিজ চক্ষুর দৃষ্টি শক্তির প্রতি তিনি অবস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না, দুই হাতে নযনদ্বয মার্জ্জনা করিযা পুনরায চাহিযা দেখিলেন. গৃহ মধ্যে তাঁহারই সম্মুখে প্রস্তর প্রতিমাবৎ নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে দণ্ডাযমানা প্রভাবতী সুরেশ কি বলিবেন, কি করিবেন—কিছুই স্থির করিতে নাপারিয়া একেবারে স্তব্ধ হইযা গেলেন কেবল পাগলের ন্যায তাহার মুখের দিকে তাকাইযা রহিলেন।

প্রভাবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল "অমন করিযা কি দেখিতেছেন? আপনি কি ভয় পাইযাছেন।

ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে সুরেশ উত্তর করিলেন, তুমি এখানে কেন আসিলে। যাও. যাও, যাও. এখনি কে দেখিযা ফেলিবে আর তুমিও মরিবে, আমিও মরিব। ছিঃ! ছিঃ! কি সাহস তোমার।

প্রভাবতী হাসিযা বলিল "সাহসতো আপনিই দিযাছেন!

রাগত স্বরে সুরেশ বলিলেন "আমি! আমি তোমাকে সাহস দিয়াছি! আমি তোমাকে আসিতে বলিয়াছি। প্রভাবতী অকম্পিত কণ্ঠে বলিল "আসিতে বলেন নাই, তবে আসিবার সাহস দিয়াছেন। বিস্ময়ে সুরেশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "কি আশ্চর্য্য আমি তোমাকে আসিবার সাহস দিয়াছি। কবে? কেমন করিয়া—তুমি যাও! যাও! কে দেখিয়া ফেলিবে! প্রভা বলিল সে চিন্তা নাই, সদর দরজায় খিল দিয়া আসিয়াছি। সুরেশ অধিকতর বিস্ময়ের সহিত বলিলেন "ও! কি সাহস!" প্রভা হাসিয়া বলিল "অই তো বলিলাম সে সাহস আপনিই গত কল্য প্রাতে আমাকে দিয়াছেন! আশ্চর্য্যান্বিত হবেন না! এই আপনার পত্র। ইহাতেই আপনি সাহস দিযাছেন, নূতন আশা দিয়াছেন, তাই আমি আসিয়াছি। সুরেশ বলিলেন "আমি কখনো তোমাকে আশা দিই নাই, কখন তোমাকে আসিতে সাহস দিই নাই। দেখ আমার শরীর অসুস্থ, মনের অবস্থাও ভাল নহে, আমাকে আর এ সময় অশান্তিতে ফেলিও না। তুমি যাও, আমার পত্রের অনুরোধ রক্ষা করিও। আমার প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছে, বড় আশঙ্কা হচ্ছে।

প্রভা এবার একটু গম্ভীর ভাবে বলিল,— "ভাইয়ের কাছে বোনের আসিতে আশঙ্কা কি? আপনি আপনার পত্রে আমাকে সহোদরার ন্যায় স্নেহচক্ষে দেখিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই আমার সাহস; সেই আমার নূতন আশা। আপনি কি মনে করেন যে, আমার সেই পাগলামির প্রস্তাবে আপনি সম্মতি দিলে আজ এরূপ ভাবে আমি আপনার কাছে আসিতে পারিতাম। যেথানে হৃদয়ে পাপ, সেখানেই আশঙ্কা বেশী! আমার হৃদয় আজ পরিষ্কার, তাই আপনার অসুখ হইয়াছে জানিয়া দেখিতে আসিয়াছি।

সুরেশ তখন আরও বিস্মিত ভাবে এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ শ্রবণ করিলেন; হৃদয়ের আনন্দ মুখে ফুটিয়া বাহির হইল; তিনি বলিলেন,—"সত্যইকি তুমি আমার সেই ক্ষুদ্র পত্রের অনুরোধ গ্রহণ করিয়াছ?"

প্রভাবতী অধোমুখে উত্তর করিল,—ক্ষুদ্র পত্র কি দাদা! সেটা ক্ষুদ্র নয়, সুবৃহৎ পত্র! তার প্রত্যেক ছত্রে অনেক কথা আছে! শুভক্ষণে আপনাকে দেখিয়াছিলাম; আপনাকে প্রাণে প্রাণেই ভাল বাসিয়াছিলাম, আমার চঞ্চল মনের প্ররোচনায় সেই ভালবাসাটা

ভিন্নপথে যাইতে চাইলে আমিও অবাধে সেই চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া গেলাম,—পত্র আপনাকে লিখিলাম, পত্র দিবার পরই আমার উত্তেজনা কমিয়া গেল, মনে অনুতাপ হইতে লাগিল, সারা রাত্রি সেই চিন্তায় কাটাইলাম, কাল প্রাতে ভোর হইতে সিঁড়িতে অপেক্ষা করিলাম, আপনার পত্র পড়িল, অমনি কুড়ইয়া লইয়া পড়িলাম, পড়িয়া যে মনে কি হইল দাদা তাহা কি বলিব। কাল সারাদিন আমি এই পত্র লইয়া কাটাইয়াছি। আপনি আমাকে বাঁচাইয়াছেন, আপনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, আপনার স্নেহ, আপনার ভালবাসা আমি পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারিব অথচ আমার ধর্ম্মে সম্পূর্ণ স্থির রাখিতে পারিব, আপনার ন্যায় উচ্চ হৃদয়ের ব্যক্তিকে দাদা বলিয়া ডাকিতে পাইব এ আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ! সেই জন্য আপনার অসুখ হইয়াছে, ডাক্তার বাবু দেখিয়া গেলে আমি কি না আসিয়া থাকিতে পারি দাদা! তাই আমি আসিয়াছি। আপনি যাহাকে নূতন জীবন দান করিয়াছেন, সেই জ্ঞান-হীনা ভগিনীর প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন, আমার হৃদয়ে আজ কোন গোল নাই—আজ এ নবজীবনে আপনার চরণে প্রণাম করিয়া যাই দাদা—আপনি আমার দাদা, আপনি আমার জীবনদাতা—যে সে দাদা নহেন, দেব-তুল্য হৃদয় আপনি—আপনি আজ হইতে আমার দেবতা দাদা।

গলদেশে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রভাবতী সুরেশচন্দ্রকে প্রণাম করিল, 'সাবিত্রী সমানভব' বলিয়া হৃদয়ের পূর্ণানন্দে সুরেশ আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রভাবতার হৃদয়ের গতি তাঁহার পত্রে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রভাবতীর মুখে এই সংবাদ জানিয়া আজ সুরেশ যে অতুল আনন্দ উপভোগ করিলেন, তাহার সঙ্গে কি আর কোন সুখের তুলনা হয়? কোথায় এই অপার্থিব ধন, আর কোথায় লালসা-বাসনাপূর্ণ ঘৃণ্য-কামনা—তৃপ্তির আমোদ।

সুরেশ বলিল,—উঠ প্রভা' ভগিনী উঠ! তোমাকে আমি প্রাণ খুলিয়া ভগিনী বলিয়া ডাকিয়া বড়ই আনন্দিত হইতেছি! আমাকে ধন্যবাদ দিও না বোন, আমাকে প্রণাম করিও না, পরমানন্দময় শ্রীহরির চরণে প্রণাম কর, তাহাকে ধন্যবাদ দাও বোন। আর এখানে এখন দেরি করিও না, যাও বাড়ী যাও।

প্রভা সানন্দে বলিল,—সে শিক্ষাও দাদা আপনা হ। তাঁহাকে প্রণাম সহস্রবার করিয়াছি আজীবন করিব। তাঁহারই করুণাতেই আজ আপনি আমার দেবতা-দাদা। আপনি বলিতেছেন, আমি যাই। কিন্তু আমি এখন লোকের ভয় করিনা, কারণ আমার মন পবিত্র তবু আপনার জন্যও ভাবিতে হয়। আমি যাই, কিন্তু আপনি কেমন থাকেন সে সংবাদ যেন আমি পাই, দক্ষিণের জানালা খুলিয়া রাখিবেন, আমি মধ্যে মধ্যে দেখিয়া যাইব। আপনি যেন এটা সর্ব্বদা মনে রাখেন। আমি আপনার জ্ঞানহীনা ভগিনী আর আপনি ইহজ্ঞানে ও পরজ্ঞানে আমার দেবতা-দাদা।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রভাবতী চলিয়া গেল।

* * * *

আমরা জানি আজীবন সুরেশ ও প্রভাবতীর ধর্ম্মতঃ ভ্রাতা ভগিনী সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ ছিল। সুরেশের উপদেশ ফলেই প্রভাবতী স্বামী সঙ্গতা এবং সন্তানবতী হইয়া কিছুকাল ইহ সুখ সম্ভোগ করিয়া সুখী হইয়াছিল। সুরেশচন্দ্র এখনও জীবিত! কিন্তু প্রভাবতী বহুদিন পরলোকে গমন করিয়াছে। মৃত্যুকালে সুরেশের সঙ্গে তাহার দেখা হয় নাই কিন্তু তার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট প্রত্যেকে শুনিতে পাইয়াছিলেন যে তাহার মুখের শেষ কথা ধ্বনিত হইয়াছিল "দেবতা-দাদা"

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ।

——০——

সীতার প্রতি অনসূয়া।

—— ০:·:০ ——

(১)

ভবে ধন্যা তুমি সীতা !
ধন্য তব মাতা পিতা,
ধন্য হল নব নারী,
শ্রীপদ তব নেহারি
পবিত্র হইল আজ এ আশ্রম বন।
ভাগ্যেতে আদর্শ নারী হল দরশন॥

২

রাজার নন্দিনী হয়ে,
দীনের বসন নিয়ে,
মনে না করিয়া তুমি রাজার গৃহিণী
নির্ভয়ে পতির সনে বনে এলে ধনি !—
নির্ব্বাসিত পতি-আশে,
বাঁধি মন ভক্তি-পাশে
পতির চরণে তব, আইলে ধাইয়া,
পদব্রজে বনে মাগো। বিভব ত্যজিয়া॥

৩

মাতা পিতা সহোদর
সবি বটে হিতকর,
পতিসম সুখদাতা কেহ নাই সীতে।
পতি-পদ সুখ-খনি নারীর জগতে॥
অধম সে নারী মাঝে
পতি সেবা যেবা ত্যজে,—
বিপদে পড়িলে যেবা করে পরিহার।
দৈন্যদশা দেখি তাঁর, করে তিরস্কার॥

৪

ধৈরয ধরম নারী,
আর মিত্র এই চারি,
পরীক্ষিত হয় সীতে। আপদের কালে।
আপদে থাকিলে স্থির, খাটি সবে বলে॥
চির রুগ্ন ধনহীন
অন্ধ, ক্রোধী, অতিদীন,
কুরূপ, বধির দেখি যে নারী পতিরে
করে নানা অপমান, ছেড়ে যায় তাঁরে॥
নরকে করে সে বাস
মুক্তির না কভু আশ,
নানা কষ্ট পায় সেই গিয়া যমপুরে।
ইহকালে দূর্ দূর্ সবে করে তারে॥

৫

নারীব্রত পতিসেবা,
পতি তার গুরু-দেবা,
এক মাত্র পতিসেবা নারীর ধরম।
মোক্ষ-ধামে যেতে পথ এ মাত্র করম॥
পরীক্ষিতে সতী-মন,
পতিরূপে নিরধন,
কুরূপ, বধির, অন্ধ ক্রোধী নারায়ণ।
স্থির তাতে ব'লে করে ক্রোড়েতে গ্রহণ॥
সম্পদ তখন এ'সে
ঘেরে তারে আশে পাশে,
জগতের লোক তারে বাখানে তখন।
মূর্ত্তিমতী দেবী জ্ঞানে করয়ে পূজন॥

৬

সতীত্ব অমূল্য নিধি,
যাহারে দিয়াছে বিধি,
কাঙ্গালিনী হলেও সে ত্রিভুবন রাণী।
দেবতা দেখিতে বাঞ্ছে চরণ দু'খানি॥
পতিব্রতা নাহি যার,
কি করিবে ধনে তার ?
কি করিবে জনে তার, সুন্দর শরীরে ?
যৌবন চলিয়া গেলে হারায় যাহারে॥
সৌরভ নাহিক ব'লে,
সুন্দর পলাশ ফুলে,
কে বল আদর করে এই ভব-মাঝে ?
গোলাপে তুলিয়া লয় কণ্টকের মাঝে॥

৭

শ্রবণ-নয়ন-বাদ,
মিটাইতে মন-সাধ,
ছিল যাহা মিটে গেল এতদিন পরে।
দেখে ভাগ্যে তব মুখ
উপজিল কিবা সুখ,
বলিতে শকতি নাই,
খুঁজে শব্দ নাহি পাই ;—
ডুবিয়াছি একেবারে সুখ-সরোবরে।
শ্রবণের শুনা যাহা, নেত্রে দে'খে তারে॥

৮

রাজলক্ষ্মী অযোধ্যার,
করি তাহা অন্ধকার,
উপনীতা ; নিজগুণে এ দীন কুটীরে ,—
মুনির তপস্যা ফল ফলিল অচিরে ॥
শুনিয়াছি মুনি মুখে,
সব লোক ছিল সুখে,
মা তব চরিত্র গুণে অযোধ্যা নগরে ;—
সেবিতে ভকতি করে শাশুড়ী শ্বশুরে ॥
দীন হীন কাঙ্গালেরে,
পরম যতন করে,
খা'য়াইতে পরাইতে সদা খোঁ'জ ক'রে।
স্বরগের সুখ প্রজা পেত নিজ ঘরে ॥

৯

মুনি কাছে শুনেছিনু,
শশীতে মিলেছে ভানু,
স্বরগ বিরাজে যেন দশরথ-পুরে।
এসেছেন শ্রীমাধব বৈজয়ন্তী ছেড়ে ॥
দেখে ভাগ্যে তব মুখ,
পেনু আজি মহাসুখ—
ডুবিয়াছি একিবারে সুখ-সরোবরে।
শ্রবণ-নয়ন-বাদ
মিঠাইতে মন-সাধ,
ছিল যাহা মিটে গেল এত দিন পরে ॥

১০

আশীর্ব্বাদ করি সীতে!
যেন পতি-চরণেতে,
সদা তব থাকে মন অচল অটল,
পতি সেবা করে কর জীবন সফল ॥
নর নারী সমুদয়
গাউক তোমার জয়,
সতীত্ব-সৌরভ তব ছুটুক চৌদিকে।
তোমা' হ'তে যেন নারী সতীগুণ শিখে ॥

শ্রীজগদ্বন্ধু চৌধুরী।

সমালোচনা।

"দেবালয়"—একখানি মাসিক পত্রিকা, ইহার তৃতীয় সংখ্যা পাঠে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে পত্রিকাখানির পরিচালন কার্য্য মন্দ হইতেছে না। অনেক কৃতবিদ্য লেখক ইহার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই জন্য আশা করিতে পারা যায—কালে ইহা একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পত্রিকা হইবে-আমরা সহযোগীর দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

—০—

"স্বদেশ কুসুম।"—শ্রীসুধাকৃষ্ট বাগচী প্রণীত একখানি স্বদেশী-ছড়া—সুকুমার মতি বালকগণের হৃদয়ে স্বদেশীভাব বদ্ধমূল করিতে হইলে"স্বদেশ কুসুম"প্রত্যেক বালক-বালিকাকে পাঠ করান উচিত। সরল পদ্যে পুস্তকখানি এরূপ সহজভাবে লিখিত হইয়াছে যে, বালকগণ খেলনা ফেলিয়া ইহা গ্রহণ করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

নিবেদন।

আমরা এখনও গ্রাহকগণের নিকট হইতে বার্ষিক সাহায্য পাইতেছি না। গ্রাহক হইলে নূতন লেখকের লেখাও আমরা সংসোধন করিয়া প্রকাশ করি। যাহাদের নিকট হইতে আমরা এ পর্য্যন্ত বার্ষিক সাহায্য পাই নাই। তাহাদের নিকট সানুনয় নিবেদন যেন তাঁহারা এই সংখ্যা পত্রিকা পাইবা মাত্র তাঁহাদের দেয় সাহায্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহ দান করেন। নতুবা আমরা সকলের নিকট ভিঃ পিঃ করিব। যাঁহাদের আপত্তি থাকে সত্বর জানাইবেন। ইতি

ম্যানেজার।

কর্ম্মস্তোত্র।

চাবে নাকি এজীবনে তবু এ দীনের পানে
করুণা নয়নে।
জীবনের গণা দিন, চলিয়াছে অনুদিন
কাল সিন্ধু পানে।
মানা নাহি শুনে কাবো, কে নিবারে তারে আরো
বিপুল এ ভবে।
পড়িতারে খরস্রোতে, সভয় চকিত চিত্তে
ত্রাহি ত্রাহি রবে—
তাই ডাকি দিবানিশি, বলিমা রক্ষগো আসি
বিশুষ্ক বদনে
তথাপি তোমাব দযা, পাবনাকি মহামাযা
মানব জীবনে
আজীবন আশা করে, বসে আছি ভব-ঘরে
তোমার কারণে
তুমিমা তুষিবে মোরে, অতীব যতন করে,
শ্রীচরণ দানে।
মায়ের করুণা পেয়ে, এ জীবনে ধন্য হয়ে
রবো কটা দিন।
ফুরালে জীবনলীলা, তার পর যত খেলা
খেলিব তথায়
পাপ তাপ অশ্রুজল, সংসারের কোলাহল
পশে না যথায়,
ছিঁড়িয়া করম ডোর, কাটিয়া ভবের ঘোর
চিরদিন তরে,
ডুবিব অতল জলে, মাতৃপ্রেমসিন্ধু তলে
পবিত্র অন্তরে।
এই করো মা নিধন কালে ডাকি কর পুটে।
তোমার কৃপায় যেন কর্ম্মডুরি যায় গো কেটে।

গৃহলক্ষ্মী।

—:০*০:—

(সমালোচনা)

"গৃহলক্ষ্মী" গৃহিণীগণের নিকট কল্পতরু। এই গ্রন্থখানি ১৩০২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ পর্য্যন্ত ইহার ৮টী সংস্করণ হইয়াছে, এই পুস্তকখানি বঙ্গগৃহিণীগণের নিকট কিরূপ আদৃত হইতেছে, ইহাদ্বারাই তৎসম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। রমণীগণকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান না করিলে, গৃহস্থাশ্রম তিষ্ঠিতে পারে না ; ইহাই আমাদের দেশের সুশিক্ষিত লোকের ধারণা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইযা অনেক পণ্ডিত নানারূপ স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ প্রণযন করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থই গৃহলক্ষ্মীর স্থান অধিকার কবিতে পাবে নাই। যেমন ভাষা তেমনি ইহাতে সমযোপযোগী দৃষ্টান্ত। কেবল এই জন্যই গৃহলক্ষ্মী অস্মৎ সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করে নাই, সর্ব্বাপেক্ষা ইহার প্রশংসা লাভের কারণ উদার ভাব। আমরা এই পুস্তকের যে প্রবন্ধটিই পাঠ করি, সেই প্রবন্ধটিতেই গ্রন্থকারের প্রভূত গাম্ভীর্য্যের ও সংসার আশ্রম সম্বন্ধে বিচক্ষণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই। গিরিজা প্রসন্ন[1] কি উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য গৃহলক্ষ্মীতে গৃহস্থাশ্রমের যাবতীয অনুষ্ঠেয় বর্ণনা করিয়াছেন এই বিষয মীমাংসা করিতে পারিলে, গৃহলক্ষ্মীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা এই প্রবন্ধে ২।৪ কথা বলিতে সাহসী হইব। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ চারিটী আশ্রমের বর্ণনা করিয়াছেন,—যথা ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বান প্রস্থ ও সন্ন্যাস। মহামুনি মনু চারিটী আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকে সর্ব্ব প্রধান স্থান দিয়া বলিয়াছেন :—

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তেসর্ব্বজন্তবঃ
তথা গৃহস্থমমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বআশ্রমাঃ

অর্থঃ—যে প্রকার বায়ু ব্যতীত কোন প্রাণীই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া প্রাণ ধারণ কবিতে পারেনা, সেই প্রকার গৃহস্থাশ্রমের সাহায্য ভিন্ন কোন আশ্রম তিষ্ঠিতে পারেনা।

মহামুনি বলিয়াছেন—জীব জন্তুর পক্ষে বায়ু যেমন, অন্যআশ্রমবাসীর পক্ষেও গৃহস্থ তদ্রূপ প্রয়োজনীয। গিরিজা প্রসন্ন গৃহস্থাশ্রমের প্রয়োজনীযতা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার অনুষ্ঠেয় এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, অতএব এই পুস্তক খানির উপদেশ গুলি প্রতিপালিত হইলে অন্যান্য আশ্রমবাসীরও মঙ্গল সংসাধিত হইবে। গৃহস্থাশ্রমবাসীর উপর যখন এতবড় একটা দাযীত্বপূর্ণ ভার রহিয়াছে, তখন সেই ভার বহনের জন্য কিরূপ উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভেই "স্বামী ও স্ত্রী-শীর্ষক প্রবন্ধে বলিতেছেন—পাপক্ষয় করিয়া মুক্তিলাভই আমাদের সকলের জীবনের উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অতি উৎকৃষ্ট উপায়। এই গার্হস্থাশ্রম বিবাহ দ্বারাই হইয়া থাকে। এই বিবাহ দ্বারাই পতি-পত্নীকে ও পত্নী পতিকে গৃহস্থ করে। এই গৃহস্থ-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াই লোকে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পাপ ক্ষয় করে।

[1] গিরিজা প্রসন্ন রায চৌধুরী বি এল প্রণীত। এই সুলেখকের সুদীর্ঘ জীবন চরিত "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইতেছে।

[2] গৃহস্থাশ্রমে যে সকল কর্ত্তব্য বিহিত রহিয়াছে সে সকল ক্রিযা গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম। "যথা সন্ধ্যোপসনা, পঞ্চমহাযজ্ঞ, অতিথি সেবা, পরিজন

পালন ইত্যাদি তাহাতে মনুষ্যত্ব বিকাশ পায়। এই সকল অনুষ্ঠানে লোকের নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি সংযত হয়, উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি পায়। এই জন্য ইহাকে গৃহধর্ম্ম বলে। গৃহস্থাশ্রম আত্মসুখের জন্য নয়, গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মচর্য্যার জন্য, পরোপকারের জন্য।"

গিরিজা প্রসন্ন "গৃহলক্ষ্মীতে" কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে যে সব উপদেশ দিযাছেন, উহা শাস্ত্র সম্মত। অতএব গৃহলক্ষ্মীর ভিত্তি প্রাচীন আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাপক্ষয় করিয়া মুক্তি লাভই সংসার আশ্রমবাসীর কর্ত্তব্য, সন্ধ্যোপসনা, অতিথি সেবা পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রভৃতি কার্য্য মুক্তির উপায়, ইহাই গিরিজা প্রসন্নের অভিমত। গিরিজা প্রসন্নের এই অভিমত প্রাচ্য দার্শনিকগণের মতের সঙ্গেই কেবল ঐক্য নহে, প্রতীচ্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের অভিমত ও এই উদার মতের পক্ষসমর্থন করিতেছে। প্রতীচ্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন—সর্ব্ববৃত্তির সামঞ্জস্য ও স্ফূর্ত্তিতেই মনুষত্ব। সন্ধ্যোপসনা, অতিথিসেবা, পঞ্চমহাযজ্ঞ এই মনুষ্যত্ব রক্ষণের অনুকূল। পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন :—

অধ্যাপনংব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তুতর্পণম্।
হোমদৈবোবলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথি পূজণম্॥

অধ্যাপনকে ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণকে পিতৃযজ্ঞ, হোমকে দেবযজ্ঞ, ভূত বলিকে ভূত-যজ্ঞ, আর অতিথি পূজাকে মনুষ্য যজ্ঞ বলে। এইসব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে হইলে প্রায় সমস্ত বৃত্তিগুলিই অনুশীলিত হইযা থাকে। গিরিজা প্রসন্নের এই উপদেশগুলি যাহারা তলাইয়া বুঝিতে চাহিবেন, তাহারাই স্বীকার করিবেন যে ইহারা বৃত্তিগুলির অনুশীলন জ্ঞাপক।

গৃহলক্ষ্মীতে যে সব আদর্শ চরিত্রের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, তাহা বড়ই প্রীতি প্রদ ও অনুসরণীয়। গিরিজা প্রসন্ন বসন ভূষণ সম্বন্ধে রমণীগণকে বড়ই কঠোর উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহার মতে সাজ সজ্জার দিকে রমণীগণ একেবারে দৃষ্টি না করিয়া যদি হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই সমাজের অনেকটা কল্যাণ হয়। এ উপদেশ প্রতিপালিত হইলে অনেক পতি স্ত্রীর অন্যায আবদার হইতে রক্ষা পায় বটে, কিন্তু এ অভ্যাস যে একেবারেই তাহারা পরিত্যাগ করিতে পারিবে, এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। স্ত্রীলোকগণকে এই সাজ সজ্জা সম্বন্ধে উদাসীন হওয়ার উপদেশ দেওযার পূর্ব্বে পুরুষকে যে উপদেশ দিতে হয় গিরিজা প্রসন্ন গৃহলক্ষ্মীতে তাহাও দিতে ত্রুটি করেন নাই।

তিনি ও স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে এজন্য কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন:—"তা পরা আর উলঙ্গ হযে থাকা সমান। ক্রেপ কি নীলাম্বরী কি শান্তিপুরী সাটী, কি সিমলার ধুতী—এ সব কি আর পরতে আছে, এ সব পরলে কি আর জাত থাকে? এ সব কাপড় ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকদের জন্যও হয নাই। যে স্ত্রীলোক এ কাপড পরে তাহাকে ধিক, আর যে স্বামী স্ত্রীকে এমন কাপড় পরাইয়া পাচ জনের সম্মুখে বাহির হইতে দেয়, তাহাকে শত ধিক।"

ধর্ম্মের উপদেশ দিতে হইলে তাহা সমাজের রীতিনীতি ও ধর্ম্মের অনুকূল করিয়া লইতে হয়। সমাজের নিয়ামক পুরুষজাতি। গিরিজা প্রসন্ন তাই পুরুষজাতিকেও এই সব বিষয় উদাসীন দেখিয়া শতবার ধিক্কার দিয়াছেন। প্রকৃতই পুরুষজাতি এসব বিষয় দৃষ্টি না করিলে ভারত যে অচীরেই পাশ্চত্য দেশের সভ্যতা শিখিয়া তাহাদের ন্যায় বিবাহ বন্ধনে শান্তি হারা হইবেন, তদ্বিষয় সন্দেহ কি?

অনেক স্ত্রীলোক নিজ সুখের জন্য স্বামীকে ঘোরতর বিপদ সাগরে নিক্ষেপ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। ইহার অনেকটা কারণ বসন ভূষণাদি বিষয়ে অসংযমতা। কয়েক